পঞ্চম অধ্যায়

মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতি : চরিত্র সৃষ্টিগত তুলনা

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য দেবচরিত্রগুলিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত এবং সেই সমস্ত দেবতাদের পূজা প্রচার ও দেবভক্তিকে বিকশিত করার অনুষঙ্গেই এসেছে মানব চরিত্রগুলি। তবুও বলা যায় কবিদের বিশিষ্ট শিল্পীসত্তার গুণে সমস্ত চরিত্রগুলিতেই এক অন্তরঙ্গ মনস্তাত্ত্বিক প্রকাশ ঘটেছে। এসব প্রতিভাবান কবিদের মধ্যে কেউ কেউ বহু আলোচিত হয়ে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন আবার অনেকে আলোচনার অন্তরালেই থেকে যান। কবিকঙ্কণ ও রামানন্দ সেরকমই দু'জন কবি যাদের রচনার বিষয়বস্তু এক হলেও প্রথমজন বহু আলোচিত ও দ্বিতীয়জন অনালোচিত। এর প্রধান কারণ কবিদের রচনায় জীবনবোধের প্রকাশ। অর্থাৎ মুকুন্দ তাঁর কাব্যের সমস্ত চরিত্রগুলিকে যতটা মানবিক ও বাস্তবিক করে প্রকাশ করেছেন— রামানন্দে তার অভাব দেখা দিয়েছে। ফলে মুকুন্দের সৃষ্ট চরিত্রগুলি যতটা জীবন্ত রামানন্দের সৃষ্ট চরিত্রগুলি সে তুলনায় কিছুটা ম্লান। উপন্যাস গুণ মিশে গেছে মুকুন্দের সাহিত্যে। কবির বিশিষ্ট জীবনবোধ, বাস্তবসচেতনতা, শিল্পীসত্তার সঙ্গে মিশে গিয়ে গড়ে করেছে এমন কিছু চরিত্র, যে চরিত্রগুলি নিতান্তই মৃত্তিকা সংলগ্ন আমাদের নিত্য পরিচিত বাংলার পরিসরের মধ্যে বিরাজমান। দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন—''কবিকঙ্কণ প্রথম শ্রেণির কবি, কিন্তু তিনি যে সমাজের চিত্র অঙ্কণ করেছিলেন, তাহা দ্বিতীয় শ্রেণির, নিম্নশ্রেণির অশিক্ষিতা ফুল্লরা, খুল্লনা ও বেহুলাকে চিনিতে বিলম্ব হইলেও তাহারা পৌরাণিক রমণীগণেরই ভগিনী এবং এক বংশের লক্ষণাক্রান্ত। মুকুন্দরামের চণ্ডীতে পুরুষের পৌরুষ না থাকিলেও উৎকৃষ্ট রমণী চরিত্র বিরল নহে।''[১] মুকুন্দের শিল্প প্রতিভায় ইতিহাস, দর্শন, সমকালীন সমাজের সুস্পষ্ট ছাপ ও অভিজ্ঞতা সংমিশ্রিত হয়েছে। কিন্তু রামানন্দের কাব্যে সমকালীন ইতিহাস অপেক্ষা বড় করে দেখা দিয়েছে ভক্তিবাদ। তিনি সব কিছুর উর্দ্ধে ভক্তিকেই বড় করে দেখিয়েছেন। তাই ইতিহাসের সেরূপ কোন প্রভাব তাঁর কাব্যে পড়েনি। কাহিনির মূল কাঠামোকে অপরিবর্তিত রেখে চরিত্রায়নে কবি সর্বাধিক স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন। তবে ফুল্লরা, ভাঁড়ুদত্ত, মুরারী শীলের মতো চরিত্ররা মুকুন্দের কাব্যে যতটা প্রাণবন্ত, রামানন্দের

কাব্যে কিন্তু কিছুটা ম্লান।

মুকুন্দের তুলনায় রামানন্দের সংস্কৃত জ্ঞান ও শিক্ষা ছিল সর্বাধিক। তিনি সম্ভবত শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায়ের দণ্ডী গোষ্ঠীর সন্ন্যাসী ছিলেন 'যিনি রাম তিনি চণ্ডী ভেদ নাহি জ্ঞানে দণ্ডী।' এই উক্তি তারই প্রমাণ। প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতত্ত্বানুসারে পাঠকের রুচি হয়তো তিনি বুঝতেন এবং কাব্য মধ্যে তারই প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। ফলতঃ চণ্ডীমঙ্গলে শিব-পার্বতী পৌরাণিক মাহাত্মে ততটা উজ্জ্বল নন, যতটা রূপান্তরিত হয়েছেন লৌকিক দেবদেবীতে। এই লৌকিকতাকে রামানন্দ অনেকাংশে গ্রহণ করেননি কিন্তু তাঁর কাব্যে এই লৌকিকতাকে বর্জন করেননি বলেই হয়তো তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যটি এতো প্রাণবন্ত ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। মুকুন্দ কাব্যের চরিত্র সৃজনে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রকে প্রায় মান্য করেননি। কাব্যের বিষয় থেকে চরিত্র সর্বত্রই মঙ্গলকাব্য ধারা ঐতিহ্যময় সংস্কৃত সাহিত্যের বিপরীতে এগিয়ে গেছে। তবে এর ব্যতিক্রমও রয়েছে অনেকাংশে। অলঙ্কার শাস্ত্রে ব্রাত্যের, অস্পৃশ্যের নায়ক হওয়ার বিধান ছিল না কিন্তু মঙ্গলাকারে বিশেষত মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলে নায়ক কালকেতু একজন ব্যাধ। তার ভোজন-শয়ন সবই অদ্ভূত, অদ্ভূত তার দেহাকৃতি—তবু সে নায়ক। রামানন্দে আমরা এই ব্যাধ কালকেতুর অভাববোধ করি। সম্ভবত সংস্কৃত কাব্য জ্ঞান ও অনুসরণের কারণবশতই কবি কালকেতুকে ব্যাধ নায়ক অপেক্ষা নায়ক করে অঙ্কণ করতে চেয়েছেন। এই ভাবে চরিত্র সৃজনে এসেছে ভিন্নতা। আমরা চরিত্রগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে মুকুন্দ রামানন্দের চরিত্র সৃজনের এই পার্থক্যকে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। চরিত্রগুলিকে পুরুষ চরিত্র ও নারী চরিত্র -এই দু'ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করব। সাধারণত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের তিনটি খণ্ড—

ক. দেবখণ্ড

খ. আখেটিক খণ্ড

গ. বণিক খণ্ড

পুরুষ চরিত্র :

ক. দেবখণ্ড : ১. শিব, ২. দক্ষ, ৩. নীলাম্বর, ৪. ইন্দ্র।

খ. আখেটিক খণ্ড : ১. কালকেতু, ২. ধর্মকেতু, ৩. ভাঁড়ু দত্ত, ৪. মুরারি শীল, ৫. কলিঙ্গরাজ, ৬. পশুকুল এবং ৭. গুজরাটের নাগরিকগণ।

গ. বণিক খণ্ড : ১. ধনপতি, ২. শ্রীপতি বা শ্রীমন্ত, ৩. সিংহল দেশের রাজা, ৪. বণিক সমাজের বণিকেরা।

নারী চরিত্র :

ক. দেবখণ্ড : ১. চণ্ডী, ২. মেনকা, ৩. ইন্দ্রের স্ত্রী (নীলাম্বরের মা), ৪. পদ্মাবতী এবং ৫. গঙ্গা।

খ. আখেটিক খণ্ড : ১. ফুল্লরা, ২. মুরারি শীলের স্ত্রী, ৩. নিদয়া ও হীরাবতী।

গ. বণিক খণ্ড : ১. লহনা, ২. খুল্লনা, ৩. দুর্বলা, ৪. লীলাবতী।

মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতি প্রত্যেকটি চরিত্র অঙ্কণেই সিদ্ধহস্ত শিল্পী। তবে কাহিনির অভ্যন্তরীণ পরিকল্পনার পার্থক্যের কারণে চরিত্র সৃজনে কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

পুরুষ চরিত্র :

ক. দেবখণ্ড : ১. শিব—চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনিতে পৌরাণিক শিবের রুদ্র ও কোমল রূপের পাশাপাশি লৌকিক ভিখারী শিবের গৃহী রূপটিকেও প্রত্যক্ষ করে থাকি। তবে সমগ্র জুড়ে শিবের প্রাসঙ্গিক উল্লেখটুকু মাত্র রয়েছে। আসলে এখানে তার স্থান গৌণ, চণ্ডীরই প্রাধান্য সর্বাধিক। ভারতীয় সাহিত্যে শিবের যে বিচিত্র রূপ আমরা দেখতে পায় সেই ভাবনার আদি উৎস প্রাগার্য প্রত্ন-উপাদান। ভারতীয় ভাবনায় শিব ধ্যানমগ্ন পশুপতি। মহেঞ্জোদারোতে প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার নানা প্রত্ন নিদর্শনের মধ্যে পাথরে একজন জটাধারী, এ্যম্বক ও ঊর্ধ্বলিঙ্গ মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়, ভারতে সেটিই শিবের আদিরূপ বলে মনে করা হয়। পরবর্তীকালে বৈদিক যুগে পশুপতি শিবের ভাবনার সঙ্গে মিশেছে রুদ্রের কল্পনা। রুদ্র হলেন বিশ্বের বার্তা, তিনি যুবা পুরুষ, প্রভূত বলের অধিকারী। তিনি রুষ্ট হলে 'শিব' বা কল্যাণ সুন্দর হয়ে ওঠেন এবং পরবর্তীকালে এই সূত্রধরেই শিবের সঙ্গে রুদ্রের মিল। মহাকাব্যের যুগে শিব রুদ্র ও মহেশ্বর এই দুই রূপেই পাওয়া যায়। আবার কালিদাসের 'কুমারসম্ভবম্' কাব্যে দক্ষযজ্ঞনাশ, শিব-সতী এবং উমা মহেশ্বরের কাহিনি বিস্তৃত রূপে বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন পুরাণের উমা ও মহেশ্বরের কাহিনির সঙ্গে কালিদাসের কাব্যের কাহিনিটির অনেক মিল পাওয়া যায়। পুরাণগুলিতে দক্ষযজ্ঞের কাহিনিতে শিবের ক্রুদ্ধ রূপ, সতীর দশমহাবিদ্যারূপ,

যোগানলে আত্মবিসর্জন, সতীর শবছেদন, হিমালয় দুহিতা উমা রূপে নবজন্ম গ্রহণ, উমা-মহেশ্বরের মিলন ইত্যাদি কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। 'বিষ্ণুপুরাণ', 'পদ্মপুরাণ' ও 'গরুড় পুরাণে' শিব দক্ষের কন্যা সতীর স্বামী 'ভব' রূপে উল্লিখিত। 'বরাহ পুরাণে' দেখা যায়, জলমগ্ন হয়ে শিব যখন তপস্যারত তখন তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যান্য দেবতারা দক্ষযজ্ঞে যজ্ঞভাগ নিতে উপস্থিত হয়েছেন। শিব তা জেনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ভৈরবনাদ করেছেন। তা থেকে রেতাল ও প্রেত সমূহের উৎপন্ন হল। শিব তাদের নিয়ে যজ্ঞস্থলে গিয়ে দেবতাদের হারিয়ে নিজেদের যজ্ঞের ভাগ আদায় করলেন। দক্ষ তখন গৌরীকে দান করে শিবকে শান্ত করলেন। 'ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে' আছে সতী দক্ষের অষ্টকন্যার মধ্যে প্রধানা। স্বামী মহাদেব জামাতা হয়েও দক্ষকে প্রণাম না করায় পিতৃ গৃহে এসে জ্যেষ্ঠ কন্যার সমাদর সতী পেলেন না। পিতার কাছে শুনে সতী প্রাণত্যাগ করলেন। ক্রুদ্ধ মহাদেবের শাপে দক্ষ চাক্ষুষ মন্বন্তরে প্রচেতাঃ পুত্র হয়ে জন্মালেন। মুকুন্দ তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গলে' এই কাহিনির আংশিক অনুসরণ করেছেন মাত্র। অন্যদিকে রামানন্দ কাহিনির এই অংশটিকে 'বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ' মতে নির্মাণ করেছেন—

''বৃহদ্ধর্ম্ম মতে ইতে বহু বিবরণ।
ভাষাতে ভারতচন্দ্র কর্য়াছে রচন।।''[২]

শিবের বিনা অনুমতিতেই সতী পিতৃগৃহে যাত্রা করেন। শিবের আজ্ঞায় নন্দী, ভূত, ডাকিনী যোগিনীও তার সঙ্গে যায়। সেখানে মা মেনকার মুখে শিবের নিন্দা শুনে ব্যথিত হন। এরপর ভূত-প্রেত দেখে সতীকে সকলে গঞ্জনা করে। দক্ষ-ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও পশুপতির পূজা না করায় সতীর সঙ্গে বিবাদ হয়। দক্ষ শিব নিন্দা করলে সতী প্রাণত্যাগ করেন। নিজ কর্মে অনুতপ্ত হন তিনি। শিব শোকে নিজের এক জটা ছিঁড়ে ফেললেন জন্ম হল বীরভদ্রের। বীরভদ্র দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করে ব্রহ্মহত্যায় মত্ত হয়ে উঠল। মেনকার অনুরোধে শিব দক্ষের প্রাণ দান করলেন কিন্তু দক্ষ নিজের মাথা ফিরে পেলেন না।—''ছাগমুণ্ড পান দক্ষ মনে অনুতাপ।''[৩] মুকুন্দের 'চণ্ডীমঙ্গল'-এ শিবের প্রধানত দুটি রূপ পৌরাণিক ও লৌকিক। কাব্যের দেবখণ্ডটি 'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের' সঙ্গে কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত। শিবের লৌকিক তথা পারিবারিক রূপটি তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শের সঙ্গে সমকালীন সমাজ অভিজ্ঞতাকে মিলিত করে। রামানন্দে পৌরাণিক শিব যতটা উজ্জ্বল লৌকিক শিব সে তুলনায় খানিকটা নিষ্প্রভ। আসলে রামানন্দ ছিলেন সন্ন্যাসী তাই তাঁর জীবনযাত্রায়

লোকজীবনের অভিজ্ঞতা কিঞ্চিত কম ছিল ধরে নেওয়া যেতে পারে। কাব্যে হয়তো তারই প্রভাব পড়েছে। এই অংশের বর্ণনায় তিনি মুকুন্দের সমালোচনা করেছেন। 'চণ্ডীমঙ্গল'-এ মুকুন্দ ও রামানন্দ শিবের পরিচয় কীভাবে দিয়েছেন তা লক্ষ্য করা যাক। মুকুন্দের কাব্যের দেবখণ্ডের 'সৃষ্টিপ্রকরণ' অংশে কবি বলেছেন—আদিদেব নিত্যশক্তি নানা মূর্তি হলেন। তার থেকে উৎপন্ন তমোগুণে মহাদেব এবং রজোগুণে সৃষ্টি হল ব্রহ্মার। ব্রহ্মার চার মানসপুত্র—সনৎকুমার, সনক, সনাতন, সনন্দ হরিভক্তির জন্য সংসারবিমুখ হলেন। তাতে ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হয়ে ভ্রূভঙ্গি করলেন। তাতে জন্ম হল শিশু মহাদেবের বা নীললোহিতকুমারের। ব্রহ্মা তার নাম রাখলেন 'রুদ্র'—

''বিধাতার হৃদয়ে বাড়িল বড় ক্রোধ।
সেই ক্রোধে ভ্রূভঙ্গি হইল বিধাতার
তাহাতে জন্মিল নীললোহিতকুমার।।
বাল্যভাবে মহাঁদেব কারণ রোদন
নাম ধাম জায়া মোর কর নিজোজন।
বিচারিয়া রুদ্র নাম থুইল প্রজাপতি
মৃত্যুঞ্জয় মহেশ ঈশান পশুপতি।''[৪]

পিতার আদেশে তিনি নির্মাণ করলেন প্রেত-ভূত নিশাচর এবং দশজন ব্রহ্মঋষি সৃষ্টি করলেন। বিধাতা নিজেই দ্বিধাবিভক্ত হয়ে শতরূপা নামে নারী এবং স্বয়ম্ভুব মনুনামে পুরুষ হলেন। এঁদেরই উত্তরপুরুষ দক্ষ প্রজাপতি। তিনি বিবাহ করেন প্রসূতিকে। তাঁদের সন্তান 'সতী'। নারদের পরামর্শে শিবের সঙ্গে সতীর বিবাহ দেন। বিরিঞ্চি নন্দন ভৃগু এক যজ্ঞের আয়োজন করেন। সেই যজ্ঞে দক্ষকে সমবেত দেবগণ প্রণাম করেন, কিন্তু জামাতা হয়েও শিব তাকে প্রণাম করলেন না। এতে দক্ষ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং শিবকে দেবসমাজ ও বেদপথ থেকে বহিষ্কৃত করতে হবে সেকথা জানালেন। আখ্যানের এই অংশে আর্য ও বৈদিক দেবসমাজের রুদ্রের সঙ্গে প্রাগার্য ও লৌকিক দেবতা শিবের সংঘাতের ইতিবৃত্তটি প্রচ্ছন্ন। শিবকে আর্য দেবসমাজ থেকে বহিষ্কারের জন্য দক্ষ বৃহস্পতিকে নিয়ে নিজেই এক যজ্ঞের আয়োজন করলেন। সেখানে অন্য দেবতাদের নিমন্ত্রণ থাকলেও শিব-সতীর কোন আমন্ত্রণ ছিল না। সতী 'বাপের-উৎসব' দেখতে যাবার জন্য স্বামীর অনুমতি চাইলেন। কিন্তু শিব জানালেন—

''বাপ-ঘরে জবে চল তবে না হইবে ভাল

ভবিষ্যৎ বহু বিড়ম্বন।''[৫]

দাক্ষায়নী কোপমতি হয়ে একাই বাপের ঘর চললেন। শিবের আদেশে নন্দী ভূত-প্রেতদের নিয়ে দেবীকে অনুসরণ করে চললেন। পিতৃগৃহে সতী দক্ষের চরণে প্রণাম জানাল। দক্ষ শিবের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে নিন্দা করলেন। পিতার মুখে পতিনিন্দা শুনে সতী—

''বাপ প্রতিকার হেতু তেজিব পরাণ।

হৃদয় সরোজে চিন্তি শিবের চরণ

দৃঢ় করি মহাদেবী পরিল বসন।

যোগেতে ছাড়িল তনু জগতের মাতা

মুকুন্দ রচিল গৌরীমঙ্গলের গাথা।।''[৬]

কবি মুকুন্দ 'ব্রহ্মপুরাণ' অনুসারে। এরপর বরাহপুরাণ ও ব্রহ্মপুরাণের বর্ণনা মিলিয়ে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের বিবরণ দিয়েছেন।

শিবের শোকপ্রকাশে মুকুন্দ মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। শিবের শোক পরিণত হল ক্রোধে। তাঁর ছিন্ন জটা থেকে উদ্ভব হল বীরভদ্রের। দক্ষের মাথা কেটে যজ্ঞকুণ্ডে ফেলা হল এবং শান্তির জন্য ব্রহ্মা স্তব করলেন। ত্রিলোচন প্রাণ সঞ্চারিণীবিদ্যা জপ করে দক্ষকে পুনর্জীবিত করলেন। দক্ষের মাথায় ছাগমুণ্ড জোড়া হল—

''ছাগ মাথা দক্ষ-কান্দে করিয়া জোড়ন।

কৃষ্ণের কৃপায় দক্ষ পাইল জীবন।''[৭]

কাহিনির এই অংশটুকুতে মুকুন্দ শিবকে স্বরূপে প্রকাশিত করেছেন। তাঁর ক্রোধ প্রকাশে, দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গে এবং সতীর দেহ নিয়ে ত্রিভুবন পরিভ্রমণে প্রকাশ পেয়েছে সেই পৌরাণিক শিব। শিব ও বীরভদ্রের ক্রোধ প্রবাহের মধ্যদিয়ে তিনি শিবের এক সর্বত্যাগী যোগীরূপই প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। অন্যদিকে রামানন্দ কাব্যের এই অংশে শিবের এক সর্বত্যাগী দিগম্বর রুপের বর্ণনা করেছেন—

''অঙ্গরাগ চিতা ধূলি কক্ষেতে ভাঙ্গের ঝুলি

শ্মশানেতে থাকেন জামাতা।''[৮]

কন্যাকে দেখার পর শিবকে নিয়ে সতীর মায়ের দুঃখের এক দীর্ঘ পদ রচনা করেছেন কবি।

যা মুকুন্দের কাব্যে অনুপস্থিত। এই অংশে শিব চরিত্রকে অনেকটা লৌকিক রূপে নির্মাণ করেছেন রামানন্দ—

''লোক না পাঠাই আমি জামাতার ডরে
লোক গেল্যে ক্ষপা নাকি অপমান করে।।
দ্রব্যজাত যে পাঠাই তাহাও না লয়।
বাপার চরিত্র সব লোকে আস্যা কর।।''[৯]

এছাড়াও বীরভদ্রের 'দক্ষ যজ্ঞ' বিনাশের চিত্রটিতে কবি হাস্যরসের উদ্রেগ ঘটিয়েছেন—

''বিষ্ণু ভক্তি দর্পণেতে ব্রহ্ম হাস্যরস।
তেঞি শিব ব্যাস আদি হাস্যতেও বশ।।''[১০]

কাহিনির অগ্রগতিতে শিবকে পরবর্তীকালে কবিকঙ্কণ মানবিক রূপে অঙ্কন করেছেন। হর-গৌরীর সংসারের চিত্রটিও অনেক বেশি মানবিক।

নারদের পরামর্শে গৌরী-শঙ্করের পরিণয় সাধনের জন্য দেবতারা বসন্ত ও মদনের সহায়তায় শঙ্করের তপোভঙ্গের আয়োজন করলেন। মহেশ্বরের প্রতি সম্মোহনবান প্রয়োগ করতে গিয়ে তার কোপানলে পড়লেন মদন। মদন ভস্মের পর গৌরী পিতার কাছে ফিরে গেলেন। পরে অপর্ণা হয়ে তুষ্ট করলেন মহেশ্বরকে। প্রেমের গভীরতার পরীক্ষা নিতে ছদ্মবেশে শিব গৌরীর কাছে গিয়ে শিব নিন্দা করতে লাগল। গৌরীর উত্তরে তুষ্ট হয়ে শিব মদনমোহন বেশ ধারণ করলেন। হিমালয়ের সম্মতিতে হর-গৌরীর বিবাহ সম্পন্ন হল। সতীর গৌরীরূপে নবজন্ম, শিবের তপোভঙ্গ, মদনদহন, গৌরীর তপস্যা, ছদ্মবেশী মহেশের গৌরী ছলনা, হর-পার্বতী বিবাহ ইত্যাদি ঘটনায় শিবের এক প্রেমিক রূপের প্রকাশ ঘটেছে। তবে রামানন্দ এই অংশগুলিতে হাস্যরসের সঞ্চার করেছেন। গৌরীকে বিবাহের জন্য মহেশ্বর সকল পাগলামো ত্যাগ করতে প্রস্তুত—

''কত বুঝাল্যাম তবু না হয় সম্মত।
লেংটা ভাঙ্গড় বল্যা হাসিল যে কত।।
অনেক কহিয়া মেনে লওয়াইনু মত।
ইতঃপর চিন্তা কর বিবাহের পথ।।
এ সকল বেশ ছাড়া হও সাবধান।

পাগলাম কর তবে খাবা অপমান।।
শিব কন যাহা বল করিব তেমন।
যতি বলে প্রভু বিয়া করিব কি এমন।।''[১১]

বিবাহ বাসরে শিবকে নিয়ে এয়োগণের রঙ্গ ও কথোপকথন শিব চরিত্রটিকে অনেকাংশে শিথিল করে তুলেছে। রামানন্দের কাব্যের এই অংশের শিব চরিত্র অঙ্কণে তিনি কবিকঙ্কণকে অনুসরণ করেছেন—

ক. ''ইশার মূলের গন্ধে পলায় ভুজঙ্গ।
বাঘছাল পৈল শিব হৈলেন উলঙ্গ।।''[১২]

খ. ''ইসর মূলের গন্ধে পালাএ ভুজঙ্গ
অঙ্গনাসমাজে হর হইলা উলঙ্গ।''[১৩]

অথবা,

খ. ''গৌরীর কপালে ছিল বাদিআর পো
কপালে চন্দন দিতে সাপে মারে ছো।।''[১৪]

খ. ''গৌরার কপালে ছিল বাদিয়ার পো।
কপালে চন্দন দিতে সাপে মারে ছোঁ।''[১৫]

শিব বিবাহের পর ঘরজামাই থাকতে এতটুকুও দ্বিধাবোধ করেন না। কাব্যের এই অংশে শিব চরিত্র নির্মাণে রামানন্দের তুলনায় মুকুন্দ অনেক বেশি বাস্তবতার পরিচয় দিয়েছেন। এখানে শিব চরিত্রে পৌরাণিকতা ও লৌকিকতার সংমিশ্রণ ঘটেছে। মেনকার খোঁটায় গৌরীর সম্মান রক্ষার্থে শিব শ্বশুর গৃহ ছেড়ে কৈলাসে যেতে সম্মত হলেন। কোন সম্বল নেই, ভিক্ষাবৃত্তি করে তাদের সংসার চলে। শিব অলস একদিন ভিক্ষা করে পরদিন বিশ্রাম করতে অধিক আগ্রহ। শুধু তাই নয় গৌরীকে নানাবিধ ব্যঞ্জন রন্ধনের নির্দেশ দেন। এ যেন বাংলাদেশের দরিদ্র অলস বাস্তববিমুখ পুরুষের চরিত্র—

''আজি সকালে ভোজন করিয়া থাকিব বিশ্রাম
আজি গণেশের মা রান্ধিবে মোর মত...।''[১৬]

অভাবের সংসারে শিবের মত বর পাওয়াতে গৌরী দুঃখ প্রকাশ করেন এবং শিব নিন্দা করেন কিন্তু রামানন্দের এ অংশে শিব চরিত্রের শিথিলতা খানিকটা কম। কবি কাহিনির

প্রয়োজনে শিবের সংসারের দারিদ্র্যের চিত্র খানিকটা অঙ্কণ করেছেন ঠিকই কিন্তু গৌরী শিবের কোন নিন্দা করেননি। বরং এ অংশে কবি রামানন্দ মুকুন্দের সমালোচনা করেছেন—

''শিব নিন্দা শুন্যা সতী ত্যজ্যাছেন কায়।
গৌরী নিন্দিলেন শিব বল্যা কেছ গায়।।
কন্দল করিয়া গৌরী গেল মহীপরে।
অন্নবিনা হৈয়া ক্ষীণা এ কথা কি ধরে।
যতি বলে দুষ্ট কথা আমি না লিখিব।
না বুঝিলে তাহারে কিরূপে বুঝাইব।।''[১৭]

এভাবেই শিব চরিত্র নির্মাণে কবি মুকুন্দ ও কবি রামানন্দ নিজেদের স্বতন্ত্রতার পরিচয় দিয়েছেন।

২. দক্ষ : চণ্ডীমঙ্গলের দেবখণ্ডে দক্ষের উপস্থিতি খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও উক্ত চরিত্রের গুরুত্বকে একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। দক্ষ কাহিনির ধারাবাহিকতাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। আবার দক্ষ চরিত্রের মধ্যদিয়ে আর্যদের ওপর অনার্যদের আধিপত্যের চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দক্ষ-শিব কলহ পাঠে সে ধারণায় জন্মে। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে— ''ভারতীয় যে সকল প্রাক্-বৈদিক দেবতা পরবর্তী হিন্দু সমাজেও নিজেদের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শিবই সর্বপ্রধান।''[১৮] দক্ষ হয়ে উঠেছেন আর্য সমাজের প্রতিনিধি।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দ ও রামানন্দ দুজনেই পুরাণ কাহিনিকে আশ্রয় করে 'ভৃগু মুনির যজ্ঞারম্ভ', 'দক্ষের শিবনিন্দা', 'দক্ষের প্রতি নন্দীর শাপ', 'শিবের নিকট গৌরীর প্রার্থনা', 'গৌরীর দক্ষালয়ে গমন', 'গৌরীর নিবেদন', 'দক্ষের শিবনিন্দা', 'সতীর দেহত্যাগ', 'দক্ষ-যজ্ঞ নাশে' 'শিবদূতের গমন', 'দক্ষ-যজ্ঞ-ভঙ্গ' ইত্যাদি পালাগুলি রচনা করেছেন। কাহিনির মূল কাঠামো এক হলেও দক্ষ চরিত্র সৃজনে উভয় কবি কাব্যের অভ্যন্তরে কিঞ্চিত পরিবর্তন ঘটিয়েছেন।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে রয়েছে—প্রজাপতি নারদের উপদেশে দক্ষ নিজ কন্যা সতীর সঙ্গে মহাদেবের বিবাহ দিলেন—

''ষোড়শ কন্যার মধ্যে মুখ্য সুতা সতী

ধর্মমোক্ষ হেতু হৈলা আপনে প্রকৃতি।
নারদের উপদেশে দক্ষ প্রজাপতি
নানাধন জৌতুকে পুরিয়া অভিলাষ
বরকন্যা দক্ষমুনি পাঠাইলা কৈলাস।''[১৯]

এই অংশের বর্ণনায় রামানন্দ নারদের উল্লেখ করেননি। বিরিঞ্চি-নন্দন ভৃগু এক যজ্ঞের আয়োজন করেন। ঐ যজ্ঞে দক্ষও উপস্থিত হন। দক্ষকে দেখে সমবেত দেবগণ প্রণাম করেন। কিন্তু জামাতা হয়েও শিব দক্ষকে প্রণাম করলেন না। এ ঘটনায় দক্ষ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন—

''শুন রে সভার লোক এ বড় দারুণ শোক
এই শিব আমার জামাতা
আইলাঙ যজ্ঞের স্থান না করে আমার মান
মোরে নম্র না নোঙাঞে মাথা।''[২০]

দক্ষ নারদকে ভর্ৎসনা করতে থাকেন এবং জাতি-কুল নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। সভায় সমবেত সকলেকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন শিব তাঁর জামাতা সেকথা স্বীকার করতে তার লজ্জা বোধ হয়। কন্যাদান করে তিনি চিন্তিত। শিবের গলায় হাড়ের মালা, পরনে বাঘছাল এসব দেখে তার লজ্জাবোধ হয়। শিবকে এখানে অনার্য সমাজের প্রতিনিধি করে অঙ্কণ করা হয়েছে এবং দক্ষ হয়ে উঠেছেন একজন দাম্ভিক আর্য ব্রাহ্মণ। কাহিনির এই অংশের বর্ণনায় ও দক্ষ চরিত্র নির্মাণে রামানন্দ মুকুন্দকেই স্মরণ করেছেন। শিবকে আর্য সমাজ থেকে বহিষ্কার ও যজ্ঞভাগ থেকে বঞ্চিত করার জন্য দক্ষ বৃহস্পতিকে আনিয়ে নিজেই এক যজ্ঞের আয়োজন করলেন। সেখানে দেবতাদের নিমন্ত্রণ থাকলেও শিব ও সতীর কোন নিমন্ত্রণ রইল না। কিন্তু কন্যার প্রতি চিন্তিত পিতার আস্ফালন ও আর্তনাদও রয়েছে। দক্ষ হয়ে উঠেছেন কন্যাস্নেহে আকুল অথচ বংশ গৌরবে উন্নত মস্তক এক ধনী পিতা—

''সতী ঝি গুণনিধি তারে বিড়ম্বিল বিধি
পতি সে দারিদ্র্য দিগম্বর...''[২১]

এই অংশে কন্যার জন্য দক্ষের শোকপ্রকাশ থেকে রামানন্দ বিরত থেকেছেন। আবার শিব নিন্দা শুনে নন্দী দক্ষকে অভিশাপ দেন—''ছাগমুণ্ড হরি দক্ষ পারি অতি তাপ।''[২২] পরিস্থিতির গভীরতা বোঝাতে এই একই কাহিনির ক্ষেত্রে মুকুন্দ অনেক বেশি বর্ণনা করেছেন—

''এমন শুনিয়া নন্দি দক্ষের বচন
কম্পমান দেহ হইল লোহিত লোচন।
দক্ষে সাঁপ দিতে নন্দী জল নিল হাতে
নাঞি হইএ দক্ষ তোমার মতি মুক্তিপথে।
মহাদেবে দক্ষ কেন বল কুবচন
অচিরাত হইয় দক্ষ ছাগল বদন।''[২৩]

সতী 'বাপের উৎসব' দেখতে যাওয়ার জন্য স্বামীর কাছে অনুমতি চাইলেন, কিন্তু শিব অনুমতি দিলেন না। বিনা অনুমতিতেই সতী পিতৃগৃহে এলেন। কন্যার আগমনে পিতৃগৃহের চিত্রটি অনেক বেশি মানবিক হয়ে উঠেছে। সতীর আগমনে দক্ষের আলয়ে সকলে পুলকিত। কাব্যের এই অংশের বর্ণনায় মুকুন্দ অপেক্ষা রামানন্দ অনেক বেশি লৌকিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কন্যাকে পেয়ে মাতার দীর্ঘ কথোপকথন আছে। সেই সঙ্গে রয়েছে পিতৃ হৃদয়ের ব্যাকুলতা। দক্ষের চরণে চণ্ডী প্রণাম করলে দক্ষ কন্যাকে আশীর্বাদ করেন। মুকুন্দে রয়েছে—''চিরজীবী হৌক স্বামী সুস্থির সুমতি।'' অন্যদিকে রামানন্দের রয়েছে—''চিরজীবী হৌক শিব সুস্থির সুমতি।।'' কিন্তু দক্ষের শিব নিন্দায় মুকুন্দ অনেক বেশি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সতীর কর্মের ফলেই শিবের এই দশা। তাই দক্ষ কন্যাকেই ভর্ৎসনা করেছেন—

''উচিত কহিতে কথা মনে পাছে পাও ব্যথা
জেবা ছিল কপালে লিখন
তোমার কর্মের গতি স্বামী হইল বামপথি
তারে যজ্ঞে আনি কী কারণ।
শিবের পরিধান বাঘছাল গলাএ হাড়ের মালা
বিভুতি ভুষণ জার অঙ্গে
শ্মশানে জাহার স্থান কেবা করে তার মান
প্রেত ভুত চলে তার সঙ্গে।
আরোহণ বৃষবরে সিঙ্গা ডম্বুর করে
ভক্ষণ ধুতুরার ফল
নাগে বড় অভিলাষ ফণি-উত্তরি বাস

ফণিহার ফণির কুণ্ডল।

তোমার কর্মের ফল স্বামী হইল পাগল

ডেড়ি সম্বল নাহি বাসে

অনুচিত তাহার মাথায় জটার ভার

দেখিয়া সকল লোক হাসে।''[২৪]

রামানন্দের 'চণ্ডীমঙ্গল'-এ দক্ষ কন্যাস্নেহে আকুল। তিনি কন্যার এই কপালের জন্য বিধাতাকে দায়ী করেছেন—

কন্যার কপাল হবে এই হাল

তাহা খণ্ডাইবে কেবা।

সিদ্ধি ঘুট্যা দিবে শ্মশানে থাকিবে

করিবেক তার সেবা।

ভিক্ষা কোচ ঘরে তারা স্নেহ করে

কত রস আছে তায়।''[২৫]

সতীর দেহ ত্যাগের পর রামানন্দের কাব্যে দক্ষ কন্যার জন্য বিলাপ করেছেন—

''তখন কান্দয়ে দক্ষ করিয়া বিলাপ।

অল্প অপরাধে সতী ছাড়্যা গেল্যা বাপ।।

বাপের যজ্ঞেতে সতী দিলা অভিশাপ।

নারী হত্যা করিলাম হৈল কত পাপ।।''[২৬]

কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে দক্ষ এরূপ কোন শোক প্রকাশ করেননি। এরপর শিবের আজ্ঞায় বীরভদ্রের দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের বর্ণনা রয়েছে। দক্ষের প্রাণ ফিরে পাওয়ার কাহিনিটি রামানন্দ কিছুটা পৃথকভাবে নির্মাণ করেছেন। মুকুন্দে আছে আশুতোষ ত্রিলোচন প্রাণ সঞ্চারিনী বিদ্যা জপ করে দক্ষকে পুনর্জীবিত করলেন। দক্ষের কাঁধে ছাগমুণ্ড জোড়া হল। রামানন্দে রয়েছে দক্ষের এরূপ অবস্থা দেখে ব্রহ্মা শিবকে অনুরোধ করলেন তিনি যেন দক্ষের প্রাণ ফিরিয়ে দেন। প্রসূতি কেঁদে শিবের কাছে প্রার্থনা করলেন—

''প্রসূতি কান্দিয়া কল্যা শিবেরে দেখিয়া।

সৃষ্টিরক্ষা কর শিব প্রাণ দান দিয়া।।

কিরূপে সহিবা বাপু শ্বাশুড়ীর তাপ।।''[২৭]

প্রসূতির কাতর প্রার্থনায় শিব দক্ষ সহ সকল প্রাণীদের জীবন দান করলেন। বস্তুত শিব আর দক্ষের দ্বন্দ্বে আত্মসম্মানবোধ আর অহঙ্কারের দ্বন্দ্ব, যে দ্বন্দ্বে অবশেষে পরাজয় হয়েছে অহঙ্কারের প্রকাশ মুকুন্দের কাব্যে যেরূপে আছে। রামানন্দের কাব্যে তা কিছুটা ম্লান।

৩. নীলাম্বর :

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে নীলাম্বরের উপস্থিতি খুব অল্প সময়ের জন্য। কালকেতুর আবির্ভাবের কারণেই নীলাম্বরের প্রয়োজনীয়তা মুখ্য হয়ে ওঠে। কাহিনির মূল বিষয় এক থাকলেও কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতির কাব্যে নীলাম্বর চরিত্র কেন্দ্রীক কাহিনির মধ্যে কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়। কবিকঙ্কণে রয়েছে নীলাম্বর হলেন ইন্দ্রপুত্র। শিব পূজার জন্য পুষ্প আহরণের ক্ষেত্রে তাকে নিয়োজিত করেন ইন্দ্র—

''নীলাম্বর পুষ্প তুলিতে নেহ পান
প্রবেশ নন্দনবনে আনন্দ হইয়া মনে
মোর বাক্যে কর অবধান।
নাহি যোজন রণে দুরন্ত অসুর সনে
না পাঠাইব তোমা দূর দেশ...''[২৮]

নানাপ্রকার ফুলে নীলাম্বর সাজি ভরিয়ে তোলে—

''আকন্দ তপন নাটা কষ্টকারি শ্বেতজটা
সূর্যমণি তুলিল গুলাল
বিসসোলা ভারদ্বাজি তুলিআ পুরিল সাজি
কোকিলাক্ষ তুলিল দুলাল।
সেবতি কর্কন্তি জুতি ইন্দ্র মূল তোলে জাতি
রঙ্গন তুলিল দুলাল।''[২৯]

দেবী চণ্ডীর মর্ত্যে পূজার প্রচলনের জন্য প্রয়োজন একজন শাপভ্রষ্ট দেবতার। যিনি মর্ত্যে গিয়ে দেবীর পূজা প্রচলন করবেন। তাই দেবী পদ্মাবতীর সঙ্গে যুক্তি করে নন্দনকাননে মায়া পাতলেন। সমস্ত উপবন ফুলহীন হয়ে উঠল। বনমধ্যে ফুলের সন্ধান করতে করতে হঠাৎ

তিনি বিজুবনে ব্যাধ ধর্মকেতুর হরিণ শিকার দেখতে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। দেবী হরিণীর বেশে চারিদিকে মায়ার সঞ্চার করলেন। পশু শিকার দেখে ক্লান্ত নীলাম্বর গাছের ছায়ায় অবসন্ন মনে ভাবলেন ব্যাধ জনমই ভালো বৃথা তিনি ইন্দ্রকুমার হয়ে জন্মালেন। বেলা হলে কিছু ফুল তুলে তিনি ফিরে আসেন। এদিকে দেবী চণ্ডী ফুলের মধ্যে পিপীলিকা হয়ে লুকিয়ে রইলেন—

''পলাশে রহিল দারুণ পিপীলিকা হইআ।
ব্যাজ জানি লঘুগতি আইসে নীলাম্বর
সুতের বিলম্ব দেখি ভাবে পুরন্দর।
খেলায় উন্মত্ত সুত কইল জত পাপ
আজি অবশ্য হর দিব অভিসাঁপ।''[৩০]

দেবী পিপীলিকা হয়ে শিবকে দংশন করলেন—

''দারুণ পিপীলিকা তার প্রবেশে কুন্তলে
মরমে দংশিলা হর হইলা আকুলে।''[৩১]

ফলে শিব নিদারুণ ক্রুদ্ধ হয়ে ব্যাধ জন্মলাভের জন্য নীলাম্বরকে অভিশাপ দিলেন। নীলাম্বর মর্ত্যে গিয়ে কালকেতু রূপে জন্মগ্রহণ করলেন। এখানে নিরন্তর কাহিনির প্রয়োজনে চরিত্রের আগমন। রামানন্দের 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর এই অংশে কাহিনির পরিবর্তন করেছেন কবি। সেই সঙ্গে চরিত্রগত পরিবর্তনও লক্ষ করা যায়—শিব বৃদ্ধ হয়েছেন। তিনি দেবীকে 'শুভচণ্ডী' নাম ধরে মর্ত্যে পূজা প্রচারের কথা বলেন। শিব নীলাম্বরকে মর্ত্যে ব্যাধ রূপে জন্মানোর নির্দেশ দেন—

''ব্যাঘ মত গুপ্তরূপে পাছুতে রৈয়াছ চুপে
তেঞি হবে ব্যাধের নন্দন।''[৩২]

একথা শুনে নীলাম্বর উচ্চস্বরে কাঁদতে শুরু করেন—

''এত শুন্যা নীলাম্বর কম্পমান কলেবর
উচ্চ সুরে করেন ক্রন্দন।।
কি হৈল আমারে হায় কি দোষে ঠেলিলা পায়
বল প্রভু কি হবে উপায়।''[৩৩]

দীর্ঘ শোক প্রকাশের পর দেবী তাকে সান্ত্বনা দেন—

''এতো শুন্যা মহেশ্বরী পুত্র বল্যা কোলে করি
স্নেহ করি হস্ত দেন গায়।।
মা বলেন নীলাম্বর আজ্ঞা করিছেন হর
যাত্যে হইল মহীর উপর।
আমি তো তোমার মাতা মস্তকে ধবাব ছাতা
মোর দেখা পাবা নিরন্তর।''[৩৪]

এই অংশে রামানন্দের নীলাম্বর কিঞ্চিৎ শিশু সুলভ আচরণ করেছেন। ফলে কাব্যে দুঃখের বাতাবরণেও হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। এই ভাবনাটুকুর মধ্য দিয়ে স্রষ্টা রামানন্দের কল্পনা শক্তির অসাধারণত্বের পরিচয় মেলে।

৪. ইন্দ্র :

দেবরাজ ইন্দ্রের উপস্থিতি কাব্য মধ্যে খুবই সামান্য অংশ জুড়ে রয়েছে। তবে পুত্র শাপগ্রস্ত হওয়ায় মুকুন্দের কাব্যে ইন্দ্রের যে প্রতিক্রিয়া রয়েছে সে তুলনায় রামানন্দের কাব্যে ইন্দ্র অনেক বেশি আবেগপ্রবণ। একজন পিতার মতোই পুত্রের জন্য শোকপ্রকাশ করেছেন এমনকি রাজ্য সুখ থেকেও বিরত থাকতে চেয়েছেন—

''শোকে কন দেবরাজ রাজ্য মোর কিবা কাজ
কি হইল হায় হায় হায়।
দেখিয়া ইন্দ্রের শোক শোকাকুল দেবলোক
আস্যা সবে করান শান্তন।''[৩৫]

খ. আখেটিক খণ্ড :

১. কালকেতু : 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর আখেটিক খণ্ডের নায়ক কালকেতু অন্ত্যজ ব্যাধ ধর্মকেতুর পুত্র। শাপগ্রস্ত হয়ে ইন্দ্র পুত্র নীলাম্বর মর্ত্যে কালকেতু রূপে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তার পূর্ব জন্মের কথা স্মৃতিপটে রেখে মুকুন্দ উক্ত চরিত্রটি নির্মাণ করেননি। মর্ত্যের ধূলি-ধূসরিত দরিদ্র ব্রাত্য ব্যাধ হিসেবেই চিত্রিত করেছেন। ফলে চরিত্রটি আদ্যন্ত সংগতি

রক্ষা করে চলেছে বলেই আমাদের কাছে চরিত্রটি এত হৃদয়গ্রাহী।

চণ্ডীমঙ্গলের আখেটিক খণ্ডের নায়ক কালকেতু। তার জীবনচর্যা ও জীবনচর্চাই কবির প্রতিপাদ্য বিষয়, তাই কালকেতু কেন্দ্রিক ঘটনাসমূহ উপস্থিত করে কবি কাহিনি ও চরিত্রটিকে পরিণতিমুখী করে তুলেছেন। তবে মুকুন্দের কাব্যে ব্যাধ কালকেতুকে যেভাবে আমরা পাই, রামানন্দ সেই গভীরতাকে ছুঁতে পারেননি। তাই রামানন্দের কাব্যে ব্যাধ কালকেতু কিছুটা ম্লান রূপে প্রকাশিত। সামগ্রিকভাবে কালকেতুর চরিত্রের তিনটি দিক উপস্থাপিত হয়েছে গ্রন্থ মধ্যে। সেগুলি হল—

১. নিদয়া - ধর্মকেতুর পুত্র রূপে

২. ফুল্লরার স্বামী রূপে

৩. গুজরাট নগর পত্তনের পর রাজা রূপে।

মুকুন্দের কাব্যে নিদয়া ধর্মকেতুর পুত্র রূপে কালকেতু পিতা-মাতার নিতান্ত অনুগত। জন্মলগ্ন থেকেই কালকেতু অপরাজেয় দৈহিক শক্তির চিত্র তার সর্ব কর্মেই প্রদর্শন করিয়েছেন কবি—

‘‘তাড়িয়া হরিণ ধরে কি কাজ ধনুক শরে
বিভা হেতু ব্যাধ চিন্তে মনে।
দৈবযোগে একবার পিতা পুত্রে লইআ ভার
হাট গেলা নিদয়ার মনে...’’[৩৬]

অথবা,

‘‘সম্বল আর্জনে বীর কালকেতু মহাবীর
দেখি সুখী হইল ধর্মকেতু
নিদয়ার সুখ বড় গৃহকার্যে বধূ দড়
কুলযশ রক্ষণের হেতু।
জেই দিন যেমন পায় তাহা সে দিবসে খায়
ডেড়ি অন্ন না রাখে আগারে
তিন বাণ শরাসন বিনে আর নাহি ধন
বাঁধা দিতে ধারে বা উধারে।

প্রভাতে সঘন ত্বরা বধে খড়্গ মৃগ বরা

প্রতিদিন করএ মৃগয়া

পুত্র হইতে ধর্মকেতু নিচিন্দ সম্বল হেতু

আনন্দিত হৃদয়ে নিদয়া।''[৩৭]

সুখের সংসার পুত্র ও পুত্রবধূর হাতে দিয়ে ধর্মকেতু ও নিদয়া মুক্তির হেতু বারাণসীতে গিয়ে অবস্থান করে।

রামানন্দের কাব্যে পুত্র রূপে কালকেতু সুসন্তান হয়ে উঠতে পারেনি। বলধারী কালকেতু পশু শিকারে দক্ষ তবে সংসারের প্রতি তার কর্তব্য জ্ঞান কিছুটা কম—

''বেচ্যা খাত্যে আনে বুড়া যত জশু ধর‍্যা।

পোড়াইয়া খান কালু সব চুরি কর‍্যা।।

আলু কচু ওল বনফল যত আনে।

জল খাই বল্যা কালু পূরেন বয়ানে।।

বেচ্যা খাওয়া হোথা যাউক মাতা পিতা ঘরে।

কালুর কল্যাণে নিত্য উপবাস করে।''[৩৮]

ফুল্লরার স্বামীরূপে কালকেতু আদর্শবান। স্ত্রীর প্রতি প্রীতি, স্নেহ ও অনুরাগে তার ঘাটতি নেই। ফুল্লরা ঘরে অন্য রমণীকে দেখে সতীনের ভয়ে কালকেতুকে ভর্ৎসনা করেছে। কিন্তু কালকেতুর মনে কোন পাপের অস্তিত্ব নেই—

''পিপিড়ায় পার্ক উঠে মরিবার তরে

কাহার সোলস্যা কন্যা আনিআছ ঘরে।

এতদিনে মহাবীর পাপে গেল মন

আজি হইতে হইলে তুমি লঙ্কার রাবণ।

বেক্তার্থ করিআ রামা কহ সত্যভাষা

মিথ্যা বাক্য হইলে কাটিব তোর নাম।

সত্য মিথ্যা বচনে আপুনি ধর্ম সাক্ষি

তিন দিবসের চাঁদ দ্বারে বস্যা দেখি।

এমন শুনিঞা বীর করিল গমন

আপনার মন্দিরে গিআ দিল দরশন।''[৩৯]

রামানন্দের কাব্যে ঠিক একইভাবে কালকেতু ক্ষোভ প্রকাশ করেছে—

''সত্য করা ফুল্লরা এখনো তুই বল।
ছল কর‍্যা আস্যাছিস করিয়া কন্দল।''[৪০]

স্ত্রীকে কালকেতু ভালোবাসে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দের কাব্যে রয়েছে দেবী দত্ত ধনে অন্যান্য দ্রব্যাদি ক্রয় কালে স্বামী সোহাগিনী ফুল্লরাকে সে ভোলেনি—

''পুরিতে জায়ার সাদ কিনিল পাটের জাদ
মণি-মুকুতা তাহে বেড়ি
হিরা নিলা মুতি পলা কলধৌত কণ্ঠমালা
কুণ্ডল কিনিল স্বর্ণ-চুড়ি।''[৪১]

রামানন্দের কাব্যে এরূপ কোন উল্লেখ নেই। মহাবীর কালকেতুর অত্যাচারে সমগ্র পশুকুল জর্জরিত। সিংহ, গজ, চমরীগাই, গণ্ডার, বারসিঙ্গা, বাঁদর, সজারু প্রভৃতি পশুগণ কেউই তার অত্যাচার থেকে রক্ষা পায়নি। কালকেতুর অত্যাচারে সমগ্র অরণ্য জগৎই ভয়ে কম্পমান। ভয়ার্ত পশুদের চণ্ডীর নিকট আকুল প্রার্থনায় তারই পরিচয় মেলে বারবার—

''মৃগ-আদি পশুগণ সভে কইল নিবেদন
অভয় দিলেন মহামায়া
ব্রাহ্মণভূমের পতি রঘুনাথ নরপতি
জয়চণ্ডী তাঁরে করা দয়া।''[৪২]

চণ্ডীর নিকট পশুগণের দুঃখ নিবেদন অংশটি একেবারেই বাদ দিয়েছেন রামানন্দ। ফলে কালকেতুর বিক্রম প্রকাশ বা শক্তি প্রদর্শন কিছুটা অসমাপ্ত রয়ে গেছে।

কালকেতু চরিত্রের পরিণাম রাজপদ প্রাপ্তি বন কেটে রাজ্য স্থাপন নগর নির্মাণ। কালকেতু বর্বর ব্যাধ জাতির প্রতিনিধি। কিন্তু সে নির্বোধও নয় বিচার বুদ্ধি আছে তার তাই অর্থ পেয়ে দেবীকে বলেছে—

''অতি নিচ কুলে জন্ম জাতিতে চোহাড়
কেহো না পরশ করে লোকে বলে রাড়।
পুরোহিত কেবা মোর হইব ব্রাহ্মণ

নীচ উত্তম হয় পাইলে কিবা ধন।"[৪৩]

রামানন্দ ব্যাধ কালকেতুর সমাজে অবস্থান বোঝাতে বিষয়টিকে আরো বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন—

"করো্যা তুমি আপনার জাত্যের আচার।
জপ পূজা করো্যা তুষ্টি হইবে আমার।।
জাতি কুল আমরা বিচার নাহি করি।
আচার না লই কিন্তু ভক্তিমাত্র ধরি।।
এত বল্যা মন্ত্র যন্ত্র দিলেন সকল।
দেখিয়া কালুর দুই চক্ষে বহে জল।।"[৪৪]

কালকেতু ক্ষুদ্র রাজা বা জমিদার হলেও তার প্রশাসন বৃহৎ রাজাদেরই এক ক্ষুদ্রতর সংস্করণ। তাই তার রাজসভায় পাইক-বরকন্দাজ হাতি-ঘোড়া সবই ছিল। গুজরাট নগরে হিন্দু-মুসলমানাদি সকল সম্প্রদায়ের লোক স্বধর্ম পালনের মধ্যদিয়ে সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে করেছে সুদৃঢ়। নানা বৃত্তির মানুষ সেখানে বাস করে। তবে কালকেতুর সৃষ্ট নগরের নাম গুজরাট কিনা সে সম্পর্কে রামানন্দের মনে এক সংশয় রয়ে যায়। কালকেতু ভাঁড়ু দত্তের শঠতা থেকে নগরবাসীকে রক্ষা করে ভাঁড়ু দত্তের যথাযোগ্য শাস্তি প্রদান করেছে। তবে ভাঁড়ু দত্তের শঠতার এই কাহিনি রামানন্দে নেই। ভাঁড়ু দত্ত সেখানে রাজা বিক্রম কেশরীর গুপ্তচরের কাজ করেছে। তবে রামানন্দের কাব্যে রাজা বিক্রম কেশরীর সঙ্গে যুদ্ধে কালকেতু যেভাবে বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন মুকুন্দের কাব্যে তা অনেকটাই ম্লান—

"ঘোরতর রণ   যেন শুষ্ক বন
পোড়ে প্রচণ্ড অনলে।
এই মত বীর   কাটে কত শির
রও নদী হৈয়া চলে।"[৪৫]

সুতরাং কিছু ব্যতিক্রম দেখা গেলেও উভয় কবির কাব্যে কবি দ্বয়ের ব্যাপক জীবনাভিজ্ঞতা, সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব এবং নিপুণ পর্যবেক্ষণ শক্তি কালকেতুর চরিত্রটিকে রক্তমাংসে সজীব করে তুলেছে—যা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে তুলনাহীন।

২. ধর্মকেতু :

চণ্ডীমঙ্গল আখেটিক খণ্ডে কালকেতুর পিতা হল ধর্মকেতু। ধর্মকেতু ব্যাধ। তাদের জীবনযাপনও নিতান্তই বন্য। দেবীর পূজা প্রচারের জন্য দৈব নির্দেশের কারণে নীলাম্বর ধর্মকেতুর পত্নী নিদয়ার গর্ভে প্রবেশ করে। মুকুন্দ ধর্মকেতু নিদয়ার সংসারের এক সুনিপুণ চিত্র অঙ্কন করেছেন; যা দেখে ব্যাধের জীবন ও লোকাচার বিষয়ে আমাদের মনে এক প্রচ্ছন্ন ধারণা জন্মে। ধর্মকেতু নিদয়ার গর্ভধারণে অত্যন্ত আনন্দিত হয়। ধর্মকেতুর গৃহে নিদয়ার সাধ দেবার কেউ নেই। তাই ধর্মকেতু নিজেই উদ্যোগী হয় নিদয়ার সাধভক্ষণে। একজন ব্যাধের যা সামর্থ্য তার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে ধর্মকেতু। নিদয়া যা কিছু খেতে আগ্রহী ছিল, তা সমস্তই স্বহস্তে তৈরি করে দিল—

‘‘নিদয়ার সাধ হেতু ঘরে জায় ধর্মকেতু
চাহিয়া আনিল আয়োজন
আপনি রাঁধিয়া ব্যাধ নিদয়ারে দিল সাধ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ।’’[৪৬]

মুকুন্দ ধর্মকেতুকে অত্যন্ত পত্নীপ্রেমী করে অঙ্কন করেছেন। পত্নীর কোন সাধই সে অপূরণ রাখেনি। রামানন্দের কাব্যে ধর্মকেতুর উপস্থিতি এতটাই সামান্য যে তার চরিত্রের কোনরূপ দিকই ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। তবে মুকুন্দের কাব্যে ধর্মকেতুর চরিত্র অনেকটাই বিস্তৃত। সে যথাযোগ্য স্বামীর মতই যোগ্য কর্তব্যপরায়ণ পিতাও বটে। সে পুত্রের বিবাহের ব্যবস্থা করে এবং অতি সমারোহের সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দেয়। বৈদিক নিয়মানুযায়ী পুত্রের বিবাহ দেন ধর্মকেতু। যদিও ব্যাধ চরিত্রের সঙ্গে তা খুব একটা মানানসই নয়—

‘‘কর্ম কার্য ছিল জত পুরোহিত সমাপিত
ধর্মকেতু শুনি সকৌতুক
শাস্ত্রমত জেবা ছিল একে একে নিবাড়িল
পশ্চাৎ করিল নান্দীমুখ।
এমন মঙ্গলকর্ম জেবা ছিল কুলধর্ম
ধর্মকেতু কৈলা সমাপন...’’[৪৭]

এছাড়াও ধর্মকেতুর বারাণসী প্রয়াণও মোটেই ব্যাধোচিত হয়নি। বস্তুত মুকুন্দ তাঁর ব্যক্তিগত

সৃষ্টি ভাবনার দ্বারা চরিত্রটিকে প্রভাবিত করেছেন। সেখানে রামানন্দ সে ভুল করেননি। তাঁর সৃষ্ট চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনিতে ধর্ম্মকেতু ও নিদয়া পুত্রের সংসারে থেকেই শেষ জীবনে স্বর্গে গেছেন।

''ধর্ম্মকেতু স্বর্গে গেল কিছু কাল পরে।
কালুর জননী স্বর্গে গেল ধর্ম্ম বরে।।''[৪৮]

আসলে রামানন্দ অত্যন্ত বাস্তব বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন তাই অতি সঙ্গতি বজায় রেখে কাহিনি নির্মাণ করেছেন।

৩. ভাঁড়ু দত্ত :

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মুকুন্দ ভাঁড়ু দত্তকে এঁকেছেন, সমগ্র মধ্যযুগের সাহিত্যে তার দোসর মেলে না। কালকেতু উপাখ্যানে গুজরাট নগর পত্তনের সময় ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় কলিঙ্গ রাজ্য থেকে অনেকের সঙ্গে ভাঁড়ুরও আগমন হয়। কাব্য মধ্যে কালকেতুর প্রতি ক্ষোভ প্রকাশের কালে নিজের বংশপরিচয় দিয়েছে—

''হরি দত্তের বেটা হঙ জয় দত্তের নাতি
হাটে যদি বেচাঙ বীরের ঘোড়া হাথি।
তবে সুবাসিত করঙ গুজরাট ধরা
পুনর্বার হাটে মাস বেচাঙ ফুল্লরা।''[৪৯]

ভাঁড়ু দত্ত অন্তঃসারশূন্য ঠুনকো সম্মানবোধে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে জাহির করার চেষ্টা করে। সে প্রথমে কলিঙ্গদেশ থেকে আসতে চায়নি। কিন্তু উপায়ান্তর না দেখে সে গুজরাট রাজ্যে এল। বুলান মণ্ডলকে সম্মানিত করতে দেখে সে ঈর্ষায় দগ্ধ হতে লাগল। তখন শুরু হল তার বাক্‌চাতুরী আর অভিনয়। তার প্রথম আগমনের চিত্রটি কবি এভাবে এঁকেছেন—

''ভেট লৈয়া কাঁচকলা পশ্চাতে ভাঁড়ুর শালা
আগু ভাঁড়ুদত্তের পয়ান
ফোঁটা পাটা মহাদম্ভ ছিঁড়া জোড়ে কোঁচা লম্ব
শ্রবণে কলম খরসান।
প্রণাম করিআ বীরে ভাঁড়ু নিবেদন করে

সম্বন্ধ পাতাইয়া খুড়া খুড়া

ছিঁড়া কম্বলে বসি মুখে মৃদু মৃদু হাসি

ঘন ঘন দেই বাহু-নাড়া।

খুড়া আইলাঙ প্রতিমাসে বসিতে তোমার দেশে

আগেতে ডাকিবে ভাঁড়ু দত্তে

জতেক কায়েস্ত দেখ ভাঁড়ুর পশ্চাতে লিখ

কুলে শীলে বিচারে মহত্ত্বে।''[৫০]

প্রত্যক্ষভাবে কালকেতুর সঙ্গে খুড়া-ভাইপোর সম্বন্ধ পাতিয়ে আপন বাবা- নৈপুণ্যের সে তার বিশিষ্টতার কথা প্রমাণে আগ্রহী। অর্থাৎ আদ্যন্ত একটি লজ্জাহীন ছলনাময় স্বার্থাভিলাষী এক কপট মানুষের ছবি আমরা প্রত্যক্ষ করি। সে তার কথার জালে কালকেতুকে অভিভূত করার চেষ্টা করে। তাই নিজে নিজেই কপট প্রশংসা করতে শুরু করে—

''জতেক কায়েস্ত দেখ ভাঁড়ুর পশ্চাতে লিখ

কুলে শীলে বিচারে মহত্ত্বে।''[৫১]

বুলান মণ্ডল যেহেতু প্রজা মুখ্যের পদ পেয়েছে। তাই তার প্রতি ভাঁড়ুর প্রবল ঈর্ষা ও ক্রোধ। কালকেতুর কাছে বুলান মণ্ডলের নামে মিথ্যা কুৎসা রটনা করতেও তার বাধে না। সে বলে—

''দেওয়ান ঘোষের বেটা বহিত আমার চিঠা

জারে বল বুলন মণ্ডল

পরিণত পুরান কাচা ভাণিত আমার ভাচা

চাষী বেটা হব দেশ মুখ

নফরের হাথে খাঁড়া বহুড়িজনের ভাঁড়া

পরিণামে দেই মহাদুঃখ।...''[৫২]

ক্ষেত্র গুপ্তের মতে—''ভাঁড়ু দরিদ্র, ভাঁড়ু ক্ষমতাহীন, অথচ তার তুল্য যোগ্য ব্যক্তি দুর্লভ, সে ভাগ্য তাড়িত—এই ভাবনা তার মনকে সমাজের প্রতি বিষিয়ে রেখেছে।''[৫৩]

সে নিজে দরিদ্র, অথচ সুযোগ পেলে দরিদ্রদের প্রতি অত্যাচারেই তার সুখ। হাটুরিয়াদের

বাচনিতে সে কথা ব্যক্ত হয়েছে—

''এমন সময়ে ভাঁড়ু দত্ত হাটে আইসে
পসারী পসার ঢাকে ভাঁড়ুর তরাসে।
পসার লুটিয়া ভাঁড়ু ভরয়ে চুপড়ি
জত দ্রব্য লয় ভাঁড়ু নাঞি দেয় কড়ি।
লণ্ডে ভণ্ডে দেয় গালি বলে শালামালা
আমি মহামণ্ডল আমার আগে তোলা।
টানাটানি করে ভাণ্ডু হাটুআ নাহি ছাড়ে
কেশে ধরি কিল লাথি মারে তার ঘাড়ে।''[৫৪]

এই কথা শুনে কালকেতু ক্রুদ্ধ হয়ে ভাঁড়ুর কাছে কৈফিয়ৎ তলব করল, তখন ভাঁড়ু বলে যে তারা বংশপরম্পরায় এভাবেই জীবিকার্জন করে এবং কালকেতুকে খারাপ কথা বলতেও ছাড়ে না—

''কাজ পায়্যা খুড়া মোর ঘুচাহ মণ্ডলি
দেখিআছি খুড়া হে তোমার ঠাকুরালী।
তিন গোটা তির ছিল এক খানি বাঁশ
হাটে হাটে ফুল্লরা পসার দিত মাস।''[৫৫]

কালকেতু নগর থেকে তাকে বিতাড়িত করলে ঠক-কপট-ভাঁড়ুদত্ত রূপান্তরিত হল ভিলেনে। জটিল মানসিকতার ভাঁড়ু এবার কলিঙ্গদেশে গিয়ে কপট কৌশলে ও বাক্যজালে সম্মোহিত করে কলিঙ্গরাজকে কালকেতুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় প্ররোচিত করল। কলিঙ্গরাজের জন্য তার দাদাকে দিয়ে ভেট বহন করানোর জন্য দাদাকে প্রলোভন দেখায়। কালকেতুর সঙ্গে কলিঙ্গরাজের যুদ্ধ হলে কলিঙ্গরাজ কালকেতুকে বন্দী করে। পরে দেবীর আশীর্বাদে যখন কালকেতু পুনরায় গুজরাটের সিংহাসনে আসেন, তখন ভাঁড়ু আবার কালকেতুর পরম বান্ধব সেজে তার কাছে ফিরে এল—

''প্রণাম করিআ বীরে ভাঁড়ু নিবেদন করে
খুড়া দেখি ঘুচিল আন্ধার।''[৫৬]

কিন্তু কালকেতু আর ভাঁড়ুর কথায় ভুলবার নয়। তার বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের শাস্তি

স্বরূপ তার মাথা মুণ্ডন করে গালে চুন কালি লাগিয়ে তাকে দেশ থেকে বিদায় করে দেবার আদেশ দেন কালকেতু—

''রসন ভিজিয়া পড়ে শোণিতের ধার
ভাঁড়ু বলে খুড়া ক্ষেমা কর একবার।''[৫৭]

মুকুন্দ প্রথম থেকেই একজন খল চরিত্র রূপে ভাঁড়ুকে অঙ্কন করেছেন। রামানন্দে ভাঁড়ু চরিত্রের উপস্থিতি অনেকটাই ভিন্ন। তিনি ভাণ্ডু তথা ভাঁড়ু চরিত্রের পরিপূর্ণতম সদ্ব্যবহার করেছেন। রাজার তলব পেয়ে ছেঁড়া ধুতি কায়দা করে পড়ে ছেঁড়া ঢেকে কোঁচা লুটিয়ে রাজার জন্য ভেট নিয়ে হাজির হল—

''ডাকাইল ভাণ্ডু দত্ত প্রজাকে ত্বরায়।।
ভাণ্ডু দত্ত ভেট লৈয়া চলিল ত্বরায়।
ছেঁড়া ধুতি পরা তার কোঁচা পড়ে পায়।।
ভেট থুয়্যা ভূলে ভক্তি করে ভাণ্ডু দত্ত।
রাজা বলে তোমাকে অনেক আসে তত্ত্ব।।
গুজরাটে রাজা হইয়াছে একজন।
ছল কর্য়া আন তারে করিয়া বন্ধন।।''[৫৮]

ভাঁড়ু রাজার অনুচর হয়ে কালকেতুর কাছে গেছে রাজার বার্তা নিয়ে। রাজা বলেন গুজরাটে একজন রাজা হয়েছে তাকে ছল করে আনতে হবে। এই সংক্ষিপ্ত রাজাজ্ঞা পেয়ে ভাঁড়ু তিনশ সৈন্য নিয়ে বিচিত্র ছদ্মবেশে কালকেতুর দরবারে চাকরি নেয়। প্রথমে গেল একশ জন ঘোড়সওয়ার, বললে আমরা রুম থেকে এসেছি। 'বিদেশী' ফৌজদের মহলা দেখে কালকেতু খুশি হয়ে তাদের সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত করল। এরপর পঞ্চাশ জন এল অস্ত্র বেচতে। এরপর ভাঁড়ু নিজে এলেন। ভাঁড়ু চরিত্র নির্মাণের অসঙ্গতি দেখিয়ে মুকুন্দের সমালোচনা করেছেন রামানন্দ। ভাঁড়ুর দৈন্যদশার কথা বিবেচনা করে রাজার জন্য যে ধরনের উপহার নিয়ে যাওয়া উচিত তারই বর্ণনা দিয়েছেন। ভাঁড়ু বস্ত্র পুষ্পমালা ও এক ফলা পেড়া নিয়ে গেলো। কালকেতুকে বলল রাজা স্বপ্নে জানতে পেরেছেন আপনি দেবীপুত্র আপনার বীরত্বে খুশি হয়ে আমাকে পাঠিয়েছে আপনাকে নিয়ে যেতে। ভাঁড়ুর কথা শুনে কালকেতু সভাসদের মত চাইলেন। অনেকে সম্মতি জানালো না। কিন্তু রাজার ছদ্মবেশী সৈন্যরা কালকেতুকে

যেতে বলল। কালকেতু প্রচুর সওগাৎ নিয়ে ছদ্মবেশী সৈন্যদের নিয়ে রাজার কাছে গেলো। রাজা তাকে বন্দী করলেন। রামানন্দের কাব্যে ভাঁড়ু দত্তের আর কোন উপস্থিতি নেই। রামানন্দ ভাঁড়ুকে একজন অতি চালাক কূটনৈতিক দূত রূপে অঙ্কন করেছেন। কবিকঙ্কণে ভাঁড়ু চরিত্রের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন হাস্যরসাত্মক এবং ঠক্ চরিত্রকে দেখতে পাই রামানন্দ একদম ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাঁড়ুকে নির্মাণ করেছেন।

৪. মুরারি শীল :

সবচেয়ে স্বল্প পরিসরে সবচেয়ে স্পষ্ট ও নিপুণভাবে যে চরিত্রটিকে অঙ্কন করতে পেরেছেন মুকুন্দ, তা হল মুরারি শীল।

মুকুন্দের কাব্যে রয়েছে—

''বান্যা বড় দুঃশীল নাম মুরারি শীল
লেখা- জোখা করে টাকা-কড়ি
পাইআ বীরের সাড়া প্রবেশে ভিতর বাড়া
মাংসের ধারা বেড় বুড়ি।''[৫৯]

মুরারি শীল সমাজের অভ্যন্তর থেকে উঠে আসা একটি অতি বাস্তব চরিত্র। কবি তীক্ষ্ণ সমাজপর্যবেক্ষণ ক্ষমতার ফলে এরূপ চরিত্রের নির্মাণ করতে পেরেছেন। মুরারি স্বয়ং বাক্চাতুরীতে অত্যন্ত পটু সে কালকেতুকে ঠকিয়ে বিনা পয়সায় মাংস খায় এবং তার প্রাপ্য অর্থ মাত্র দেড়বুড়ি কড়ি দেওয়ার ভয়ে বাড়িতে লুকিয়ে থাকে। কালকেতু আংটি বিক্রি করতে এলে সে ঘর থেকে গোপনে শুনে আর লোভ সংবরণ করতে পারে না। পত্নীর কথা বিশ্বাসযোগ্য করে তুলবার জন্য সে খিড়কীর পথ দিয়ে গৃহে প্রবেশ করল এমনভাবে যাতে মনে হয় সে সত্যিই বাইরে গেছে। মুরারি এতটাই শঠ ও চতুর যে এসেই সে প্রথমে অঙ্গুরীর কথা বা কালকেতুর পাওনার কথা না তুলে তার সঙ্গে পরম হৃদ্যতার সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করে—

''বান্যা বলে ভাইপোর হবে নাহী দেখি তোর
এ তোমার কেমন বেভার।''[৬০]

অর্থাৎ আত্মীয়তার ছলে সে কালকেতুকে বশ করে তার অঙ্গুরীটি হস্তগত করতে চায়। শুধু

তাই নয় কালকেতুকে বলে আংটির মূল্য অতি সামান্য। মাত্র আড়াই বুড়ি কড়ি। কালকেতু তাকে আংটি বিক্রয় করতে অসম্মত হলে কালকেতুর মন গলানোর চেষ্টা করে—

''ধর্মকেতু ভায়্যা সনে কইনু লেনা দেনা
তাহা হইতে ভাইপো হইআছ অধিক সেয়ানা।''[৬১]

কিন্তু কালকেতু নিজ সিদ্ধান্তে অনড় এমন সময় আকাশে দৈববাণী হয় যা কেবল মুরারিই শুনতে পায়। দেবী তাকে আংটির সঠিক মূল্য দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন এবং এও বলে—

''অকপটে সাত কোটি টাকা দেহ বীরে
বাড়িবে তোমার ধন অভয়ার বরে।''[৬২]

মুরারি শীল বোঝে, আংটির যথার্থ দাম দিলে লাভ তারই এবং এই লাভের কারণে কালকেতুকে তার ন্যায্য পাওনা দিতে সম্মত হয়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এরূপ চরিত্র বিরল।

রামানন্দ কিন্তু মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনির এই অংশটির সমালোচনা করেছেন—

''অঙ্গুরী পায়্যাছে কালু বল্যা কেহ গায়।
অঙ্গুরী বেচিয়া সাত কোটি ধন পায়।।
তাহাতে যতেক দোষ বুঝিবা সকলে।
টাকা ভাঙ্গাইতে কালু নগরেতে চলে।''[৬৩]

রামানন্দ তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে মুরারি নামের কোন চরিত্রই সৃষ্টি করেননি। রামানন্দের কাব্যে বাঞ্ছারাম বলে একজন বণিক রয়েছে। কালকেতু তার কাছে মোহর ভাঙাতে এলে বণিক বাঞ্ছারাম তাকে ঠকাতে চায়—

''মোহর দেখিয়া বলে বেঙ্গা যে পিত্তল।
ঘষিয়া মাজিয়া বাপা কর্যাছ উজ্জ্বল।''[৬৪]

আবার পরিহাস করে বলে—

''কোন দেশে ভাইপো করিয়াছ কামাই।
বেটি হৈলে বেটা মোরে করিম জামাই।''[৬৫]

বণিককে মাতা নির্দেশ দেন—

''বণিকের মাতা বলে শুন বাঞ্ছারাম।
কালুর সঙ্গেতে তুমি কর্য্যো নিষ্ঠাকাম।।''[৬৬]

টাইপ চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও কবির নিজস্ব সমাজ অভিজ্ঞতা ও চরিত্রের সঙ্গে একাত্মতাবোধের সংমিশ্রণে চরিত্রটি এক নিজস্ব রূপ লাভ করেছে।

৫. কলিঙ্গরাজ :

কলিঙ্গরাজ চরিত্রটি কাহিনির প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছে। চরিত্রটির বিশেষ কোনো ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য নেই। তবে মুকুন্দের সৃষ্ট কলিঙ্গরাজের তুলনায় রামানন্দের সৃষ্ট কলিঙ্গরাজ চরিত্রটি একজন রাজা হিসেবে অনেক বেশি দক্ষ ভূমিকা পালন করেছে। দেবী প্রদত্ত ধনদানের পর কালকেতু দেবীর নির্দেশেই কলিঙ্গরাজের অধীনস্থ বন কেটে গুজরাট নগর নির্মাণ করলেন। মুকুন্দের কাব্যে রয়েছে গুজরাট নগর নির্মাণের খবর কলিঙ্গরাজ অনেক পরে পেয়েছে। ভাঁড়ুর প্ররোচনায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

রামানন্দ মুকুন্দের কাব্যের অভ্যন্তরে বঙ্গর দেশের নাম গুজরাট হওয়াতে কিছুটা হতবাক হয়েছেন—

‘‘গুজরাট দেশে জাত্যের বিশেষে
নাম আছে ভাগে ভাগে।
বাঙ্গালার নাম সে দেশে কি কাম
ইহা শুন্যা ধান্ধা লাগে।।’’[৬৭]

কলিঙ্গ রাজার বাড়ি বিজয়নগর। নাম কেশরী সিংহ রায়। তিনি দূত মারফত খবর পান যে কালকেতু বন কেটে নগর নির্মাণ করেছে। কালকেতু রাজার অনুমতি বা লিখিত পত্র ছাড়াই সে কাজ করেছে। সেজন্য হরদত্ত মুন্সীকে পাঠায় কালকেতুর কাছে। কালকেতু বলে—

‘‘কেশরী সিংহেরে জানি আমি তাকে নাহি মানি
হেথা নাহি তার অধিকার।’’[৬৮]

কালকেতুর সঙ্গে তার যুদ্ধ শুরু হয়। ভাঁড়ুদত্তকে গুপ্তচর করে পাঠানো হয় কালকেতুর কাছে। ভাঁড়ু কৌশলে কালকেতুকে রাজ বন্দী করে নিয়ে আসে। পরে দেবীর নির্দেশে কালকেতুকে মুক্ত করে দেন। মুকুন্দের তুলনায় রামানন্দ চরিত্রটিকে অনেক বেশি বাস্তব সম্মত করে অঙ্কণ করেছেন।

৬. পশুকুল :

গোষ্ঠী চরিত্রের আলোচনার প্রসঙ্গে প্রথমেই আসে পশু চরিত্রগুলির কথা। বনের পশুরা হয়ে উঠেছে তৎকালীন শাসনপীড়িত জনতারই প্রতিভূ। এই পশুগণেরা সবাই মানুষের মতোই ভাষার মাধ্যমে তাদের মনোকষ্ট ব্যক্ত করে দেবীর কাছে। তবে মুকুন্দ তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পশুদের দুঃখ-কষ্টকে তুলে ধরেছেন, রামানন্দ কিন্তু তা করেননি। আসলে মুকুন্দ দেবীর সঙ্গে পশুগণের কথোপকথন -এর মধ্যদিয়ে যেন শাসক নিপীড়িত মনুষ্য কুলকেই চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। পশুদের এভাবে মানবায়িত করতে গিয়ে কবি কিন্তু কোথাও ঔচিত্য ভ্রষ্ট হননি। মুকুন্দ নিজে সমকালীন শাসকের অধীনে থেকে নানা অত্যাচার সহ্য করেছিলেন। তাই একথা সহজেই অনুমেয় যে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অঞ্চলের সমস্ত মানবগোষ্ঠীই শাসকের অত্যাচারে নিপীড়িত হয়েছিল। তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতাই যেন পশুসমাজের বাচনে স্পষ্টীকৃত করেছে। কালকেতু যেন এখানে শাসকের প্রতীক হয়ে উঠেছে আর পশুসমাজ হল অত্যাচারিত প্রজাকুল। ‘‘কালকেতুর পশুহনন তাদের কাছে যেন রাজশক্তির নিষ্ঠুর অত্যাচার।’’[৬৯]

চণ্ডীর দেউলে প্রথমে পশুরাজ সিংহের নিবেদন—

‘‘ভালে টিকা দিআ মাতা কৈলে মৃগরাজ
করিব তোমার সেবা রাজ্যে নাহি কাজ।’’[৭০]

এভাবে কোক (নেকড়ে), ভল্লুক, বরাহ, হস্তিনী, বারসিঙ্গা, তুলারু (রোমশ হরিণ), ঘোড়ারু (ঘোড়ার মত হরিণ), নকুল প্রভৃতিও তাদের অন্তহীন দুর্দশার কথা নিবেদন করেছে।

পশুকুলের কাতর ক্রন্দন বিচলিত করে তোলে দেবীকে। দেবী তাদের রক্ষা করবেন বলে আশ্বস্থ করলেন। মৃগয়া ও পশুদের ক্রন্দন অংশটি রামানন্দের কাছে বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই কাহিনির এই অংশটি রামানন্দ খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন—

‘‘পশুর কান্দুলী ভগবতী শুনি
ঘুচান সব জঞ্জাল।।
গোধিকা হইয়া বন মাঝে গিয়া
রহিলেন নারায়ণী।’’[৭১]

৭. গুজরাটের নাগরিকগণ :

গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের চরিত্র চিত্রিত হয়েছে গুজরাটের নাগরিকদের উল্লেখে। চরিত্রগুলির একক চরিত্ররূপে কোনো গুরুত্ব নেই। গোষ্ঠী চরিত্র হিসেবে চরিত্রগুলি সমুজ্জ্বল। বন কেটে কালকেতু গুজরাট নগরটি প্রতিষ্ঠা করে এবং তার রাজা হয়ে বসে। পার্শ্ববর্তী কলিঙ্গরাজ্য থেকে লোকের ঝড় ও বন্যার কারণে দেশ ত্যাগ করে নতুন নগরীতে আশ্রয় নেয়। বুলান মণ্ডল তাদের মধ্যে অন্যতম। চাষী প্রজাদের নেতা বুলান মণ্ডল গুজরাটে এসে প্রজাদের নেতৃত্ব নেয়। সে বোঝে যে কালকেতুর রাজ্যে বসবাস করলে তিন বছর কোন কর দিতে হবে না এবং তারা নানাবিধ সাহায্যও পাবে। তাই বুদ্ধিমান বুলান মণ্ডল কলিঙ্গ অধিবাসীদের বুঝিয়ে গুজরাটে নিয়ে আসে—

''শুন ভাই বুলন মণ্ডল
আইস আমার পুর সন্তাপ করিব দূর
কানে দিব হেমকুণ্ডল।

এভাবে গুজরাটে নানা শ্রেণির মানুষের বসতি স্থাপিত হয়। ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান প্রজাদের আগমন ঘটে। এছাড়াও আসে বৈশ্য, মহাজন, বৈদ্য, কায়স্থ, গোপ, তেলি, নাপিত, প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের হিন্দু প্রজা। পরবর্তীকালে হাটুরিয়াগণকে পেয়ে থাকি। যারা ভাঁড়ুর অত্যাচারে কালকেতুর কাছে গিয়ে অভিযোগ করেছে। এসব বিভিন্ন চরিত্রের আনাগোনা কবিকঙ্কণের কাব্যে পেয়ে থাকি। রামানন্দের চণ্ডীমঙ্গলে বুলান মণ্ডলের মতো চরিত্র দেখতে পাওয়া যায় না। সেই সঙ্গে সাধারণ নাগরিকের কথা উল্লেখ থাকলেও মুকুন্দ যেভাবে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন পেশার জনগণের উল্লেখ করেছেন, রামানন্দ সেসব উল্লেখ থেকে অনেকটাই বিরত থেকেছেন।

গ. বণিক খণ্ড

১. ধনপতি :

আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস'-এ বলেছেন চণ্ডীমঙ্গলের মধ্যে বর্ণিত দুটি কাহিনির মধ্যে ধনপতি সওদাগরের কাহিনিটিই প্রাচীনতর। বাংলার এক বৃহত্তর সমাজ জীবনের রূপ ধনপতির কাহিনির বর্ণনার মধ্য দিয়ে বিস্তৃতভাবে বিবৃত হয়েছে।

মুকুন্দরাম এই ধনপতির জীবন বর্ণনায় বাস্তবতারই অনুসারী হয়েছেন। রামানন্দ আদিরসকে পরিত্যাগ করে কাহিনি ও চরিত্রটিকে পরিণামমুখী করে গড়ে তুলেছেন। ধনপতি বিত্তশালী। কাজেই মধ্যযুগের বিত্তবানদের দোষগুণ তার চরিত্রে বর্তমান, এছাড়াও বহু বিবাহের যে যুগে ছিল তা ধনপতির দ্বিতীয় বিবাহের পরিকল্পনাতেই পাওয়া যায়।

ধনপতি নিঃসন্তান। উজানী নগরে বসবাস কালে সে রাজার আনুকূল্য পেয়েছিল। শিশুরা তার অত্যন্ত প্রিয়। তাই শিশুদের সাথে ধনপতি পায়রা ওড়ায়। এটা তার বিলাসিতাও বটে। আবার নারীদের সঙ্গে বিলাস আমোদও করে। রামানন্দ ধনপতি চরিত্রের এই দিকটিকে ত্যাগ করেছেন। মুকুন্দের কাব্যে পায়রা ওড়াতে গিয়ে ধনপতি খুল্লনার দর্শন পায়। ধনপতির মনে বিবাহ বাসনার উদয় হয়। কিন্তু ভীরু ধনপতি প্রথম পত্নী লহনার অনুমতি পেতে স্ত্রীকে নানান কথায় ভোলাতে থাকে শেষে 'পাটশাড়ী' ও 'পাঁচপল' সোনার গহনা পেয়ে লহনা অনুমতি দেয়। রামানন্দ এসব কুরসকে পরিত্যাগ করে ধনপতির চরিত্র অঙ্কন করেছেন। শুধুমাত্র নিঃসন্তান বলেই ধনপতি দ্বিতীয় বিবাহ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে এবং পায়রা ওড়ানোর কোনো কাহিনি এখানে নেই, বরং ঘটককে বলেছেন একজন ভালো মেয়ের সন্ধান করতে—

''সন্তান না হয় তার খেদ করে বারবার
বিবাহ করিতে হৈল আর।।
লক্ষ্মী পতি বণিকের ঘরে।
সেই কন্যা রূপধাম খুলনা হৈয়াছে নাম
ঘটকের সন্ধান যায়্যা করে।।''[৭২]

মুকুন্দের কাব্যে রয়েছে—খুল্লনা ধনপতিকে দেখে চিনতে পারে। তার জেঠার জামাতা হল ধনপতি। লক্ষপতির কন্যা খুল্লনার যখন বিয়ে হয় তখন সে উদ্ভিন্ন যৌবনা - বারো বছরের কিশোরী। ধনপতি চরিত্রের কোনো গভীরতা কবিকঙ্কণ অঙ্কন করেননি। গতানুগতিক জীবনের বিলাসবহুল জীবনেই ধনপতি অভ্যস্থ। ধনপতির গার্হস্থ্যজীবন ছিল বন্ধনহীন। দুই স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও প্রবাসে অন্য নারীর সঙ্গ তাকে আনন্দ দিয়েছে। অন্যদিকে রামানন্দের কাব্যে ধনপতি ইন্দ্রিয় আসক্তি থেকে মুক্ত, তার দৃঢ় ব্যক্তিত্ব তার নিয়ন্ত্রী শক্তি। মুকুন্দ এবং রামানন্দ দুজনে দুই ভিন্ন মেরু থেকে ধনপতির চরিত্রটিকে অঙ্কন করেছেন।

মুকুন্দের কাব্যে রয়েছে রাজার আদেশে সোনার খাঁচা গড়াতে সে গৌড় নগরে গিয়েছিল। নববিবাহিত স্ত্রীকে ছেড়ে যেতে হবে বলে প্রথমে সে অসম্মতি প্রকাশ করে। আবার প্রবাসে গিয়ে স্ত্রীদের ভুলে গিয়ে ভোগ সুখে মেতে ওঠে—

''পরস্ত্রী লুব্ধ হইআ পাসুরিলে নিজ জায়া
সুখে আছ গউড় নগরে।''[৭৩]

গৃহে ফিরে খুল্লনার রূপ যৌবনে আকৃষ্ট হয়। ধনপতির প্রবাসে অবস্থানকালে খুল্লনা নিগৃহীতা হয়েছিল লহনার দ্বারা। সাধুর জাল চিঠি দেখিয়ে সে খুল্লনাকে ছাগল চড়াতে বাধ্য করেছে। সেকথা পরবর্তীকালে জানতে পেরে ধনপতি লহনাকে তিরষ্কার করেছে। মুকুন্দের কাব্যে ধনপতি ব্যক্তিত্বহীন কাপুরুষ। সতীত্বের পরীক্ষায় খুল্লনা অগ্নিপ্রবেশ করলে সে মাটিতে লুটিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছে। অন্যদিকে সিংহল যাত্রার পূর্বে লহনার কাছে খুল্লনার চণ্ডীপূজার কথা শুনে ধনপতি মুহূর্তেই ক্রোধে ফেটে পড়ে। ধনপতি চণ্ডীর ঘটে পদাঘাত করে। ফলে চণ্ডীর অভিশাপ ও ক্রোধের শিকার হতে হয় তাকে। রামানন্দের কাব্যে ধনপতি চরিত্রটি চারিত্রিক দিক থেকে কঠোর। সে খুল্লনার প্রতি অবিচারের কথা নগরবাসীর কাছে শোনে এবং ক্রুদ্ধ হয়ে লহনাকে ত্যাগ করতে চায়। লহনা বলে এসবের জন্য দুর্বলা দায়ী—

''দুষ্টা বলে লওয়াইল দুর্বলা কুমতি।
শুন্যা দুর্বলাকে দূর করে ধনপতি।।
যতি বলে দুষ্টের কোথাও নাই স্থান।
নরকেতে আর তার কত অপমান।।''[৭৪]

কবি আরো বলেছেন—

''মনুষ্যের ব্যবহার লিখিলেই পাপ ভার
গ্রাম্য গীত বল্যা তাকে কয়।
মুনি বাক্য যে যে ঠাঞি তা লিখিলে পাপ নাঞি
গ্রাম্য গীত শুন্যা পাপ হয়।''[৭৫]

মুকুন্দের কাব্যে পাওয়া যায় ধনপতির চণ্ডীর ঘটে পদাঘাত করে বলে দেবীও তাকে সিংহল যাত্রায় অশেষ দুঃখ দিয়েছে। এসব ঘটনা আকস্মিকতা দোষেদুষ্ট। রূপজ মোহগ্রস্ত ধনপতির জীবনে এটাই সম্ভবত পাওনা ছিল। ধনপতি স্থির বুদ্ধির অধিকারী ছিল না। চঞ্চলমতি

ভোগবিলাসী পুরুষ, আলস্য ও ইন্দ্রিয় শৈথিল্যের স্রোতে ভেসেছে।

কবিকঙ্কণের কাব্যে ধনপতিকে একজন বণিক রূপে আমরা কমই পেয়ে থাকি, ধনপতি বার বার রাজ আদেশ পালনের জন্য বাণিজ্যে বেরিয়েছে। সবটাই যেন তার অনিচ্ছা সত্ত্বে। রামানন্দ এবিষয়ে অনেক বেশি সচেতন। তাই রাজ আদেশে নয় অনেক সময় স্বইচ্ছাতেই বাণিজ্যে গেছে ধনপতি। তবে রাজ আজ্ঞায় ধনপতি রওনা হয়েছে সিংহলের উদ্দেশ্যে। এখানে কাহিনি ও চরিত্র অনেকটাই এক—

"সিংহল দ্বীপেতে সাধু যাও শীঘ্রগতি।।
বরণের চেষ্টা বাণ্যা অনেক পাইল।
তাহা না শুনিয়া রাজা সাজাইয়া দিল।"[৭৬]

এরপর কালীদহে কমলে-কামিনী দর্শন, সিংহলে বারো বছরের কারাবাস পুনরায় গৃহে প্রত্যাবর্তন সব ঘটনায় এক।

ফলে মুকুন্দ ও রামনন্দ ধনপতিকে চরিত্রের দিক থেকে কিছুটা ভিন্ন ভাবে অঙ্কন করার চেষ্টা করলেও কাব্যের অন্তিমে তাঁরা দুজনেই এক স্রোতে এসে মিলিত হয়েছেন।

২. শ্রীমন্ত :

শ্রীমন্ত শাপভ্রষ্ট ইন্দ্রপুত্র মালাধর। দেবী চণ্ডিকা তাঁর পূজা প্রচারের জন্য মালাধরকে ধনপতির পুত্র শ্রীমন্ত রূপে মর্ত্যে নিয়ে আসেন। শ্রীমন্তের যখন জন্ম হয় তখন তার পিতা বহু দূরে সিংহলে কারাগারে বন্দী ছিল। ফলে শ্রীমন্ত জন্ম থেকে কোনোদিনও পিতাকে দেখেনি। ধনপতি সিংহল যাত্রার পূর্বে খুল্লনা পাঁচ মাসের গর্ভবতী ছিল। ধনপতি সিংহলে যাওয়ার আগে তার নামকরণ করে যায়। এই চরিত্রটি অঙ্কনে মুকুন্দ কিংবা রামানন্দ শ্রীমন্তকে কৈশোরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলেও তার আচরণ ও উক্তি তাকে যুবকে পরিণত করেছে। বয়স অনুপাতে সে অতিরিক্ত আত্মমর্যাদা সচেতন। সুদর্শন শ্রীমন্তের শৈশব কেটেছে মায়ের আদর ও সোহাগে। শ্রীমন্ত অল্প বয়সেই সর্বশাস্ত্রে শিক্ষিত হয়ে ওঠে। পণ্ডিত জনার্দন ওঝার সঙ্গে তার তর্ক চলে। ফলে অসহিষ্ণু পণ্ডিত তাকে পাঠশালা থেকে বহিষ্কার করে। গুরু শ্রীমন্তের জন্ম নিয়ে কটাক্ষ করে—

"পিতা দীর্ঘ পরবাসে তোমার জনম

নাহি জান আপনার জাতের মরম।
মর‍্যা গেল ধনপতি হইল বহু দিস
মায়ের আইয়ত হাথে ভোজন আমিষ।
জারুয়া ঢেমনে নাহী শুনাঞি পুরাণ
এই হেতু আমার এতেক অপমান।''[৭৭]

শ্রীমন্তকে 'বেদুয়া' 'ঢেমন' বলে গালি দেন শ্রীমন্তও গুরুর কথায় প্রতিবাদ করে—

''পঞ্চাশ কাহন বাড়ি খাও মাসে মাস
আমী জদি জারুয়া তোমার জাতিনাশ।''[৭৮]

শ্রীমন্ত শুধু যুক্তিবাদী নয়, সে অন্যায়ের প্রতিবাদী। পঁচাশি বছরের গুরুর ভ্রম সংশোধন করে সে তার ক্রোধকে সংবরণ করতে পারেনি। গুরু তাকে আরো কটু কথা বললে ক্ষোভে ও ক্রোধে সে গুরুকে প্রণাম না করে অবজ্ঞা করেছে। শ্রীমন্ত একজন আত্মসম্মান সচেতন বালক। তার পিতৃভক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অভিজাত সম্ভ্রমবোধ। আর তাই মাত্র বারো বৎসর বয়সে সে সিংহল যাত্রা করেছে।

রামানন্দের কাহিনি একেবারে ভিন্ন। হয়তো গুরু শিষ্যের সম্পর্কের তিক্ততা তিনি প্রকাশ করতে চাননি। রামানন্দের চণ্ডীমঙ্গলে রয়েছে—

শ্রীপতির ঘরে একজন ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করতে এলে শ্রীপতিকে তার পিতৃপরিচয় নিয়ে মন্দ কথা শোনায়—

''কোপেতে ব্রাহ্মণ কৈল কুবচন
পিতা মরিল বিদেশে।
হৈয়া ধনমত্ত না জানিম তত্ত্ব
ব্রাহ্মণে অভক্তি শেষে।।''[৭৯]

তার কথা শুনেই ক্রোধে ও পিতৃশোকে পিতার অন্বেষণে বেড়িয়ে পড়ে শ্রীমন্ত। রামানন্দের কাব্যে শ্রীমন্তের চরিত্রের ক্ষোভ বা উগ্রতা প্রকাশ পায়নি বরং তিনি শ্রীমন্তকে বালকসুলভ হিসেবে অঙ্কন করেছেন—

(i) ''পিতৃ অন্বেষণ কৈল প্রাণপণ

পিতা পিতা বল্যা কান্দে।

আকুল হইয়া বিদরয়ে হিয়া

শিশু প্রাণ নাহি বান্ধে।''[৮০]

(ii) ''সিংহলেতে কাজ নাই যাদু থাক কোলে।

এত বল্যা কোলে কর্যা ঝাঁপেন আঞ্চোলে।।

সেদিন ফিরিলা শিশু মায়ের মায়ায়।

এইরূপ ক্রন্দনেতে এক মাস যায়।।''[৮১]

(iii) ''ছয় ডিঙ্গা মগরাতে ভাসিয়া বেড়ায়।

বিস্মিত হইয়া ঘরে শিশু পানে চায়।।''[৮২]

(iv) ''মায়েরে পড়িল মনে শিশু আর নাহি শোনে

মুখ দেখ্যা সবে পায় ভয়।

বুঝিয়া শিশুর ব্যথা সংক্ষেপে কহেন কথা

দাতারাম কাতর হৃদয়।''[৮৩]

(v) ''পাঁথার দেখিয়া হিরা ফাঁফর হইল ফিরা

জননীকে দেখিবার চায়।

যতি রামানন্দ কয় সাগর ভাবিতে ভয়

তাহে যায় অতি শিশু তায়।''[৮৪]

এভাবে সমগ্র কাব্যে কবি শ্রীমন্তকে শিশু বলে সম্বোধন করেছেন। এমনকি সিংহল রাজদরবারেও তাকে শিশু বলেই সম্বোধন করা হয়েছে—

''শিশু বলে দেখাইব নহিলে মস্তক দিব

আমি এই করিলাম পণ।।

রাজা বলে সত্য হয় অর্দ্ধ রাজ্য দিব তয়

সুশীলা কন্যাও দিব দান।''[৮৫]

কিন্তু শ্রীমন্তকে আচার-আচরণ, সাহস ও পদক্ষেপ—সবই বয়সের তুলনায় অনেক বেশি পরিপক্ক করে রচনা করেছেন মুকুন্দ চক্রবর্তী।

৩. সিংহল দেশের রাজা :

সিংহল দেশের রাজা হচ্ছেন একজন দুরাচারী মানুষ। তিনি সহজেই ক্রোধান্বিত হয়ে পড়েন। ধনপতির কথায় কমলে-কামিনী দৃশ্যটি দেখতে না পেয়ে তাকে কারাগারে বারো বছর বন্দী করে রাখেন। ঠিক একই ব্যবহার করেন শ্রীমন্তের সঙ্গেও শ্রীমন্ত তাকে কমলে-কামিনী দৃশ্যটি দেখাতে অসমর্থ হলে হত্যার নির্দেশ দেন। অন্তিমে দেবীর নির্দেশে উভয়কেই মুক্ত করেন এবং কন্যা সুশীলার সঙ্গে শ্রীমন্তের বিবাহের ব্যবস্থা করেন। কবিকঙ্কণ এবং রামানন্দ যতি উভয়ের কাব্যেই এই চরিত্রের কোনরূপ পরিবর্তন হয়নি।

৪. বণিক সমাজের বণিকেরা :

মুকুন্দের কাব্যে রয়েছে খুল্লনা ধনপতির ঘরে ফিরে এলে বণিক সমাজ ধনপতির ঘর ত্যাগ করে। কারণ—

''এক নিশা জার নারী পরগৃহে থাকে
অনুদিন তাহারে গঞ্জএ সর্বলোকে।''[৮৬]

বণিক সমাজ বলে খুল্লনা সতীত্বের পরীক্ষা দিতে রাজি হয় তবেই তারা ধনপতির ঘরে অন্ন গ্রহণ করবে। বণিকেরা নানাভাবে খুল্লনার সতীত্বের পরীক্ষা নেয়। পরে বণিক সমাজ নিজের ভুল বুঝতে পারে। রামানন্দের কাব্যে এই বণিক সমাজকে পাওয়া যায় না। তাঁর কাব্যে জ্ঞাতি বন্ধুজন এমনকি ব্রাহ্মণ ও রাজার উল্লেখ রয়েছে—

''সাধু ধনপতি করিছে বসতি
কিছু দিবসের পরে।
জ্ঞাতি বন্ধুগণ করে নিমন্ত্রণ
নাহি আসে তার ঘরে।।''[৮৭]

আবার লহনার সতীত্ব পরীক্ষা হয় ব্রাহ্মণের বাড়িতে—

''রাজা বলে ধনপতি পরীক্ষা করিবে সতী
ব্রাহ্মণের বাড়ী কর স্থান্।''[৮৮]

কবিকঙ্কণের কাব্যে যেখানে খুল্লনার সতীত্ব পরীক্ষায় বণিক সমাজেরই পুরো ভূমিকা ছিল, সেখানে রামানন্দের চণ্ডীমঙ্গলে বণিকের প্রধান স্থান বহুলাংশে দখল করেছে ব্রাহ্মণ সমাজ।

নারী চরিত্র :

(ক) দেবখণ্ড

১. চণ্ডী : 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' চণ্ডীকে আমরা নানারূপে দেখতে পাই। চণ্ডীর এই বিবিধ রূপের সঙ্গে মার্কণ্ডেয় ও বৃহদ্ধর্মপুরাণের অংশ বিশেষের মিল রয়েছে। পৌরাণিক অংশে দেবী চণ্ডীর চরিত্র চিত্রণে প্রায় সমস্ত কবিরাই ঐক্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। তবে পৌরাণিক অংশে কবিকল্পনার অবকাশ না থাকলেও কালকেতু উপাখ্যানে মুকুন্দ সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব কল্পনার দ্বারা চণ্ডীর রূপ নির্মাণ করেছেন। দেবীর রূপ নির্মাণের এই অংশটির তীব্র সমালোচনা করেছেন রামানন্দ—

''দেবীর বক্ষের পরে বীরগণ চিত্র করে
কাঞ্চলীতে পশু পক্ষী যত।।
নিমাই চরণ রায় প্রতি পদে দোষ গায়
পুস্তকের নাম দোষো নাস।''[৮৯]

মুকুন্দ চক্রবর্তী এবং রামানন্দ যতির কাব্যে দেবী চণ্ডীকে আমরা প্রধানতঃ চারটি রূপে পেয়ে থাকি। যথা—

১. দক্ষকন্যা সতীরূপে

২. শিবের পত্নী গৌরী রূপে

৩. কালকেতু আখ্যানে দেবী চণ্ডিকা রূপে

৪. ধনপতি আখ্যানে দেবী চণ্ডিকা রূপে

কাহিনির দেবখণ্ডে মিশে রয়েছে পৌরাণিক দক্ষকন্যা সতী ও হিমালয় দুহিতা পার্বতী তথা গৌরীর কথা। কবি মুকুন্দ কিংবা কবি রামানন্দ তাঁদের কাব্যে সতী চরিত্রের যে চিত্রটি অঙ্কন করেছেন তাতে পুরাণের অনুসরণ করেছেন মাত্র। মুকুন্দের কাব্যের দেবখণ্ডে 'মনুর প্রজাসৃষ্টি' অংশে দেখি, শতরূপা ও মনুর উত্তরপুরুষ হলেন দক্ষ প্রজাপতি। প্রসূতির সঙ্গে বিবাহে জন্ম হল ভবানী বা সতীর। নারদের পরামর্শে মহাদেবের সঙ্গে বিবাহ হয় সতীর—

''প্রসূতিরে পাণিগ্রহণ কৈল দক্ষমুনি
জন্মিল তাহার সোলো তনরা রূপিণী।
ষোড়শ কন্যার মধ্যে মুখ্য সুতা সতী

ধর্মমোক্ষ-হেতু হৈলা আপনে প্রকৃতি।
নারদের উপদেশে দক্ষ প্রজাপতি
মহাদেবে বিবাহ দিলেন কন্যা সতী।
নানাধন জৌতুকে পুরিলা অভিলাষ
বরকন্যা দক্ষমুনি পাঠাইলা কৈলাস।''[৯০]

রামানন্দ এই একই কাহিনিকে অনুসরণ করেছেন। ভৃগু মুনির যজ্ঞে শিব দক্ষকে প্রণাম না করায় দক্ষ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং শিবকে অপমানিত করার জন্য নিজে একটি যজ্ঞের আয়োজন করেন। সেখানে শিব ব্যতীত সকলকেই নিমন্ত্রণ জানানো হল। পিতা দক্ষের যজ্ঞে বিনা নিমন্ত্রণেই সতী যেতে চাইলেন। সতী অবুঝ, অভিমানিনী। মহাদেব অনিমন্ত্রিতের কথা বললেও সতীকে পিতৃগৃহ গমন থেকে নিবৃত্ত করতে পারলেন না। কাব্যের এই অংশে সতী চরিত্রে লৌকিক তথা মানবিক দিকটি প্রকাশিত হয়েছে। রামানন্দ ও কবিকঙ্কণ সতীর প্রার্থনা ও ক্রিয়াকলাপের মধ্যে বাঙালি কন্যার অভিলাষকে রূপ দিয়েছেন। সাত বছর সতী পিতৃগৃহে যাননি। বাপের বাড়ি গিয়ে তিনি পিতামাতার স্নেহ পাবেন। সতী যেন মাতৃস্নেহ পিপাসিনী বাঙালি ঘরের কন্যা। পিতার ওপর তার অগাধ বিশ্বাস—

''দূর কর বিবাদ পুরহ আমার সাধ
মাএর রন্ধনে খাব ভাত।
পর্বত কাননে বসি নাঞি পাট-পড়সি
সীমন্তে সিন্দূর দিতে সখী
একতিল জথা জাই জুড়াইতে নাঞি ঠাঞি
বিধি মোরে কৈল জন্মদুঃখী।
পিতা মোর পুণ্যবান দিবেন অনেক দান
কন্যাগণে করিবেন বেভার...''[৯১]

আবার,

''মায়ের হাতেতে ভাত বসিয়া বুনের সাত
খাই গিয়া বল একবার।।
সবাকে দিবেন বাবা ধন।

আভরণ পরিধান লখিয়া জুড়াবে প্রাণ

সংক্ষেপে করিল বিরচন।''[৯২]

পিতার কাছে মান ও উপহার পেতেও তাঁর চিত্ত উৎসুক। স্বামীর নিষেধ বচন না শুনে সতী একাই রওনা দিলেন বাপের বাড়ি। শিব নন্দীকে সতীর পিছু পিছু পাঠালেন এবং সঙ্গে দিলেন কিছু প্রয়োজনীয় সেবা-উপকরণ। সতী পিতার কাছে স্নেহ পেলেন কিন্তু স্বামীর প্রতি অবহেলা ও অপমান সহ্য করতে না পেরে ক্রুদ্ধ সতী স্বামীর নিন্দার প্রতিবাদে যোগানলে তনু ত্যাগ করলেন। নন্দীর মুখে এই অশুভ সংবাদ শুনে শোকার্ত ও ক্রুদ্ধ শিব ধ্বংস করলেন দক্ষযজ্ঞ। কবি মুকুন্দ এবং রামানন্দ দেবীর সতী রূপে পৌরাণিক উপাদানের সঙ্গে লৌকিক উপাদানকে মিলিয়ে দিয়েছেন। কাব্যে দেবীর দ্বিতীয় রূপ হিমালয় কন্যা পার্বতী রূপে। সতী জন্মান্তরে হলেন পার্বতী বা উমা। মুকুন্দ অবশ্য উমা নামটি ব্যবহার করেননি। তিনি বলেছেন পার্বতী ও গৌরী। রামানন্দ শুধুমাত্র গৌরী নামেই উল্লেখ করেছেন, তবে দু-এক জায়গায় দুর্গা নামেও সম্বোধন করেছেন। উভয় কবির কাব্যের কাহিনি মোটামুটি এক। তবে রামানন্দ ভক্তিরস প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কাহিনির কিঞ্চিত পরিবর্তন করেছেন মাত্র। গৌরীর জন্ম, তাঁর রূপবর্ণন, হরগৌরীর মিলনের জন্য মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ প্রচেষ্টায় মহাদেবের কোপানলে মদনদহন, পার্বতীর প্রেমতপস্যা, পার্বতীকে মহাদেবের ছলনা, শিবের মদনমোহন বেশে আত্মপ্রকাশ, হরগৌরীর বিবাহ এই কাহিনিগুলি কাব্যে রয়েছে। বিবাহিতা গৌরীর লৌকিক কন্যা ও গৃহিনী রূপ মুকুন্দ ও রামানন্দের লেখনীতে একান্ত মানবিক হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। বিবাহের পর অলস স্বামী ও ভোজনপটু দুই পুত্র কার্তিক ও গণেশকে নিয়ে বাপের বাড়িতে সুখেই কাটাচ্ছিলেন তিনি। গৌরী নিজে ঘরের কাজে মা মেনকাকে সাহায্য না করে সখীদের সঙ্গে পাশা খেলায় মত্ত। তাই মা মেনকা কন্যাকে গঞ্জনা দিলেন—

''মিথ্যা কাজে ফিরে পতি নাঞি চাষবাস

ভাত কাপড় কত না জোগাব বার মাস।

দুগ্ধ উত্তলিআ পড়ে নাঞি দেহ পানি

সখি সঙ্গে খেল পাশা দিবস রজনী।''[৯৩]

ঠিক একই বর্ণনা রামানন্দেও রয়েছে। তবে কিঞ্চিৎ অন্যভাবে—

''পাশা খেলিছেন দুর্গা বল্যা দশ দশ।

দেখিয়া মেনকা রাণী হইল বিরস।।
ভর্ৎসিয়া মেনকা কিছু কহিছে বচন।
বাছা তুমি যাও নিজ শ্বশুর ভবন।।''[৯৪]

অভিমানে স্বামী-পুত্র নিয়ে গৌরী বাপের বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন কৈলাসে। এরপর স্বামী গৃহে যে অন্নাভাবের চিত্র মুকুন্দ অঙ্কন করেছেন, রামানন্দে তা অনুপস্থিত। মুকুন্দের গৌরী নিরুপায় স্বামীকে বলেন শিব যেন ত্রিশূল বাঁধা দিয়ে ঘরে চাল নিয়ে আসেন । একথা শুনে শিব রোষে ঘর ছাড়েন। গৌরী নানা খেদ প্রকাশ করেন। শেষ পর্যন্ত সখী পদ্মার পরামর্শে তিনি মর্তে পূজা প্রচারে ব্রতী হন—

''কি জানি তপের ফলে হর মেল্যাছে বর
সই সাঙ্গাতিন নাঞি আইসে দেখিআ দিগম্বর।
বাপের সাপ পোএর মউর সদাই করে কলি।
গনার মূষা ঝুলি কাটে আমি খাই গালি।
বাগ বলদে সদাই দ্বন্দ্ব নিবারিব কত
অভাগি গৌরীর কপালে দারুণ দৈবে হত।
মৌর মূষায় দ্বন্দ্ব সদাই কন্দল
অই নিমিত্তে সদাই কলি মোর কর্মের ফল।
দারুণ কর্মের দোষে হইলাঙ দুঃখিনী
ভিক্ষার ভাতে দারুণ বিধি করিল গৃহিণী।''[৯৫]

রামানন্দ এই অংশে গৌরী চরিত্রটিকে কিঞ্চিত ভিন্নভাবে নির্মাণ করেছেন। কবি মনে করেছেন যিনি অন্নের দেবতা তাঁর ঘরে অন্নাভাব দেখানো 'দুষ্টকথা'র সমান। তাই কাব্যে তিনি মুকুন্দের সমালোচনা করে বলেছেন—

''শিব নিন্দা শুন্যা সতী ত্যজ্যাছেন কায়।
গৌরী নিন্দিলেন শিব বল্যা কেহ গায়।।
কন্দল করিয়া গৌরী গেলা মহীপরে।
অন্নবিনা হৈয়া ক্ষীণা এ কথা কি ধরে।।
যতি বলে দুষ্টকথা আমি না লিখিব।

না বুঝিলে তাহারে কিরূপে বুঝাইব।।''[৯৬]

রামানন্দের গৌরী অভাবের তাড়নায় পূজা প্রচারে ব্রতী হননি। শিবের নির্দেশে মর্তে পূজা প্রচার করেছেন—

''সিদ্ধি খায়্যা কন হর গৌরী মোরে দেও বর
পৃথিবী রাখিতে কর মন।
ভাঙ্গেতে ভুলিয়া থাকি কবে জানি মুদি আঁখি
না জানি কি হয় বা কখন।।
শুভচণ্ডী নাম ধর মনুষ্যের হিত কর
বারিতে কর গা অধিষ্ঠান।
সর্ব্বজাত্যে ঘরে ঘরে তোমা পূজ্যা মহীপরে
অমঙ্গল হইতে হবে ত্রাণ।
চণ্ডী কন ত্রিলোচন শুন প্রভু নিবেদন
তব আজ্ঞা না হয় হেলন।''[৯৭]

এরপর কাহিনিতে নরখণ্ডের সূচনা হয়। কাহিনির এই অংশে আমরা দেবীকে সতী কিংবা গৌরী রূপে নয় পশুরক্ষাকর্ত্রী বৈদিক অরণ্যানী, পৌরাণিক কৌমারী ও আদিবাসী ওরাওঁদের শিকারের দেবতা চাণ্ডীর এক মিশ্রিত রূপে প্রত্যক্ষ করে থাকি। তবে মুকুন্দ এবং রামানন্দ এই পর্বে দেবী চণ্ডীর মধ্যে বিভিন্ন পৌরাণিক দেবীকেও সমন্বিত করেছেন। চণ্ডী প্রথমে কলিঙ্গরাজকে স্বপ্নাদেশ দিয়ে পূজা দেওয়ার কথা বলেছেন। সেখানে তিনি নিজেকে দক্ষকন্যা ও হিমালয়পুত্রী বলেছেন। কলিঙ্গরাজ দেবীকে স্তব করেছেন দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, বিপদনাশিনী উমা, বিন্ধ্যশিখরবাসিনী, মধুকৈটভ-বিনাশ-সহায়িকা ইত্যাদি নানান রূপে। মুকুন্দ দেবীর পৌরাণিক রূপের সঙ্গে লৌকিক রূপের উপাদানকে একত্রিত করেছেন। দেবীর পশুগণের কাছে পূজা গ্রহণ, কালকেতুকে ছলনা ও পরে রাজ্যসম্পদ দান ইত্যাদির মধ্যে পূর্ববর্ণিত পৌরাণিক রূপটি নেই। কালকেতু উপাখ্যানে দেবীকে দেখি পশুগণের পূজা নিতে। এর আগে তিনি পূজা নিয়েছেন কলিঙ্গরাজের কাছে। দেবী এখানে একাকি পূজিতা। মহামায়া রূপে দেবী পূজা নিয়ে সিংহকে পশুদের রাজা করলেন। পশুদের রক্ষা করতেই কালকেতুর ব্যাধজীবন ঘুচিয়ে দেবী তাকে রাজা করার পরিকল্পনা করলেন। কালকেতু একদিন পশু

শিকারে বেরোলে দেবী গোধিকারূপে তার হাতে বন্দী হয়ে কুটিরে এসেছেন। ফুল্লরা এসে দেখল রত্ন বিভূষিতা এক সুন্দরী রমণীকে। ফুল্লরা সতিনের আশঙ্কায় দেবীকে তার দুঃখের বারমাস্যা শোনাল, কিন্তু দেবী তাকে স্বরূপ দেখাননি। শেষে কালকেতু তাঁকে বধ করতে উদ্যত হলে দেবী স্বরূপ প্রকাশ করেছেন। কালকেতু উপাখ্যানে দেবীর রূপ ও চরিত্র বর্ণনায় মুকুন্দ ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের দ্বারাই বেশি চালিত হয়েছেন। দেবী কালকেতুকে রত্ন-অঙ্গুরী ও সাতঘড়া ধন দিলেন এবং 'নীচ জাতি ব্যাধের নন্দন'কে শুধু ধনই দিলেন না তার কানে মন্ত্রও দিলেন। রামানন্দে কিন্তু শুধুমাত্র সাত ঘড়া ধনের উল্লেখ রয়েছে। রত্ন অঙ্গুরীর প্রসঙ্গে রামানন্দ মুকুন্দের সমালোচনা করেছেন—

''অঙ্গুরী পায়্যাছে কালু বল্যা কেহ গায়।
অঙ্গুরী বেচিয়া সাত কোটি ধন পায়।।
তাহাতে যতেক দোষ বুঝিবা সকলে।
টাকা ভাঙ্গাইতে কালু নগরেতে চলে।।''[৯৮]

দেবীর কৃপায় কালকেতুর গুজরাট নগর নির্মাণ, কলিঙ্গরাজের সঙ্গে যুদ্ধ। কারাগারে কালকেতু দেবীর চৌতিশাস্তব ইত্যাদি ঘটনা রয়েছে। সেখানে আর একবার প্রসিদ্ধ সমস্ত শক্তিদেবীর সঙ্গে চণ্ডীকে একাত্ম করে দেখানো হয়েছে। এর মধ্যেও কবির শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ্য সংস্কারই ফুটে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে কলিঙ্গরাজ কালকেতুকে মুক্তি দিয়েছেন এবং কালকেতু শাপান্তরকালে স্বর্গে ফিরে গেছে।

দ্বিতীয় আখ্যান 'বণিক খণ্ডে' চণ্ডী প্রথমে মেয়েলি ব্রতের দেবী অভয়া মঙ্গলচণ্ডী। 'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ' এর ৪৪ অধ্যায়ে এই দেবীর উল্লেখ রয়েছে। দেবী এই রূপে দেখা দিয়েছেন উজানী নগরে সম্পন্ন বণিক ধনপতির দ্বিতীয়া পত্নী তরুনী খুল্লনার কাছে। রাজা বিক্রমকেশরীর আদেশে ধনপতি স্বর্ণপিঞ্জর আনতে গেলেন গৌড়ে। স্বামীর অনুপস্থিতিতে ধনপতির প্রথমা পত্নী লহনা দুর্বলা দাসীর পরামর্শে অশেষ কষ্ট দিয়ে বনে ছাগল চরাতে পাঠিয়েছে। একদিন সর্বশী ছাগলটি হারিয়ে গেলে খুল্লনা বনে সন্ধান করতে করতে ইন্দ্রসুতা পঞ্চকন্যাকে হেমঘটে চণ্ডীপূজা করতে দেখে। এই দেবী অভয়া মঙ্গলচণ্ডী। এই দেবীর পূজা করলে হারানো বস্তু ফিরে পাওয়া যায়। দেবীর প্রসাদে খুল্লনা হারানো ছাগল ফিরে পেল। দেবী ধনপতিকে ঘরে ফিরতে বলেছেন। ধনপতি ফিরে এলে পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে খুল্লনাকে

তার চরিত্রের বিশুদ্ধতার পরীক্ষা দিতে হয়েছে। দেবীর কৃপায় খুল্লনা সেসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হয়েছে। কিন্তু শিব পূজক ধনপতি স্ত্রী দেবতার পূজা করবেন না। তাই ক্রুদ্ধ হয়ে দেবীর ঝারি চরণে ঠেলে বাণিজ্য যাত্রায় গেছেন। রামানন্দের কাব্যে অবশ্য এরূপ কাহিনি নেই। বণিক রাজার আদেশে বাণিজ্যে গেছেন। সেখানে কালিদহে দেখতে পেলেন দেবীর 'কমলে কামিনী' মূর্তি। এই কাহিনি কবি মুকুন্দ এবং রামানন্দ পেয়েছিলেন 'বৃহদ্ধর্ম পুরাণ' থেকে। আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে' এই দৃশ্যটিকে 'সমুদ্র মরীচিকা' বলেছেন। আবার অনেকে দেবীর এই রূপকে— পৌরাণিক গজলক্ষ্মী মূর্তিও বলেছেন। দেবীর এই রূপের সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের যোগ রয়েছে। বৈদিক খিলসূক্ত 'শ্রীসূক্তে'র (ঋগ্বেদ, পঞ্চম মণ্ডল) মধ্যে লক্ষ্মী দেবীর সঙ্গে পদ্মের নানা যোগ বর্ণিত। 'বিষ্ণু পুরাণে' বলা হয়েছে সমুদ্রমন্থনে লক্ষ্মীদেবী ওঠার পর দিগগজগণ হেমপাত্রে বিমল জলে সর্বলোকমহেশ্বরী দেবীকে স্নান করিয়েছিল। 'কূর্ম পুরাণে' বিষ্ণু-মায়ার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে এই দেবী দেবাসুর মানব নিখিল বিশ্বকে গ্রাস করেন, আবার সৃজন করেন। শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে—''বৃহদাকার হস্তী কি এখানে বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরই প্রতীক মাত্র? পরবর্তীকালের কবীর প্রভৃতির প্রহেলিকা - কবিতার ভিতরেও এই ভাবের আভাস দেখিতে পায়। বাঙলা মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে আসিয়া দেবীর যত প্রকারের রূপান্তর দেখিতে পাই তাহার ভিতরে একটি বিশেষ লক্ষণীয় রূপান্তর হইল দেবীর লৌকিক রূপান্তর।''[৯৯] সুকুমার সেন 'কমলে-কামিনী' মূর্তির ভিন্নতর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, প্রাচীন ভারতে শ্রী বা লক্ষ্মীর প্রতীক ছিল পদ্ম এবং সঞ্চয়ের প্রতীক ছিল হস্তী বা নাগ। এই গজলক্ষ্মী মূর্তি বণিকদের জাতি বৃত্তির লাঞ্ছন রূপে এবং উপাস্য দেবী রূপে স্বীকৃত হয়েছিল। ধনপতি এবং শ্রীপতি যে মায়ামূর্তি দেখেছিলেন তা প্রথমে সিংহল রাজকে দেখাতে পারেননি। ফলে মিথ্যাচারের অভিযোগে উভয়েই কারাগারে বন্দী হয়েছেন। শ্রীমন্তকে প্রাণদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে। শেষ পর্যন্ত শ্রীমন্ত চৌত্রিশাক্ষরে দেবীর স্তব করে বিপদমুক্ত হয়েছেন। নিষ্ঠুরা দেবী পুনরায় ভক্তবৎসলা হয়েছেন। ধনপতিকে দেবী অর্ধনারীশ্বর মূর্তি দেখিয়েছেন—

''ধ্যানে ধনপতি পূজে মৃত্তিকা - শঙ্কর
চণ্ডিকা রহিলা তার অর্ধকলেবর।
ডানি ভাগে সিংহ রহে বাম ভাগে বৃষ

পিঠে বাম ভাগে চণ্ডী দক্ষিণে মহেশ।''[১০০]

ধনপতি বুঝলেন মহেশ-পার্বতী একই দেহে বিরাজমান। দেবী এখানে আবার পৌরাণিক মূর্তিতে দেখা দিয়েছেন।

২. মেনকা : মেনকা হলেন গৌরীর মা। দক্ষযজ্ঞে সতী প্রাণ ত্যাগের পর হিমালয় গৃহে মেনকার গর্ভে পুনরায় জন্ম নেন। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' মেনকার প্রসঙ্গ বেশ কয়েকবার উত্থাপিত হয়েছে। কাব্যে মেনকাকে দুটি পর্যায়ে প্রত্যক্ষ করা যায় — গৌরীর বিবাহকালীন অবস্থাতে এবং দ্বিতীয়ত গৌরীর বিবাহের পরবর্তীকালে বাপের বাড়িতে অবস্থান কালে। কবি মুকুন্দ এবং কবি রামানন্দ উভয়েই মেনকা চরিত্রটিকে মানবিক করে অঙ্কন করেছেন। গৌরীকে কন্যা রূপে পেয়ে হিমালয়-মেনকা আনন্দিত। গৌরীর বাল্যকালের নানান ক্রিয়াকলাপ এবং মেনকার মাতৃস্নেহ রামানন্দ যতি সুনিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন—

''ক্রুদ্ধ হৈয়া কখনো ভূমেতে গড়াগড়ি।
মেনকা মারিতে ধায় উঠ্যা রড়ারড়ী।।
কান্দেন হাসেন কবু অঙ্গ ভঙ্গী করি।
আধ আধ কথা কন মার গলা ধরি।।
অঞ্চলে লুকায়্যা কন দেখিতে না পাবা।
হাসিয়া মেনকা ধর‍্যা বলে কোথা যাবা।।''[১০১]

মুকুন্দের কাব্যে মেনকার চরিত্রে এরূপ বাৎসল্যরস অনুপস্থিত।

নারদের পরামর্শে হিমালয় শিবের সঙ্গে গৌরীর বিবাহ সংগঠিত করেছিলেন। বিবাহ আসরে শিবের উদ্ভট ও অ-পাত্রসুলভ আচার-আচরণে মেনকা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। শিবের গলায় হাড়ের মালা, বাঘছাল পরিহিত শিব বিয়েতে এসেছেন 'বৃষভ' বাহনে। আবার জামাইয়ের সর্বাঙ্গে বিষধর সর্প। এই অবস্থা দেখে কোন মাতৃ হৃদয় নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। মেনকার কথনে প্রাক্ বিবাহ অনুষ্ঠান ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে—

''মেনকা সুন্দরী দধি ফেলিল চরণে
অঙ্গের ভূষণ দেখি বিষধরগণে।
অস্থিভস্ম বিভূষণ দেখি কলেবর

হইআ বিরসমূখি চিন্তিত অন্তর।
কান্দে মেনকা গৌরীর মায়া মোহ
ঝলকে ঝলকে নয়নে পড়ে লোহ।
চরণে নূপুর সাপ সাপ কটিবন্ধ
পরিধান বাঘছাল দেখি লাগে ধন্ধ।
অঙ্গদ কঙ্কণ সাপ সাপের পইতা
চক্ষু খাইআ এমন বরে দিলাঙ দুহিতা।
গৌরীর কপালে ছিল বাদিআর পো
কপালে চন্দন দিতে সাপে মারে ছো।
ঔষধ সারিআ ঘৃত দিলেন কপালে
ঘৃতজুত ললাটে লোচনে বহ্নি জ্বলে।
দেখিআ বরের রূপ মনে লাগে ধাঁদা
কোন ভাগ্যে সাপের মাঝে উদয় কইল চাঁদা।
হেন বরে গৌরী দিল কি দেখি সম্পদ
বাপ হইআ মূঢ়মতি কইল কন্যাবধ।''[১০২]

কন্যার জন্য মায়ের অন্তরাত্মা কেঁদে উঠেছে এবং স্বামীর প্রতি ধিক্কার বর্ষিত হয়েছে। পরবর্তীকালে জামাতার মদনমোহন রূপ দেখে তাঁর বিষাদ কিছুটা মুছে গেছে।

মেনকার চরিত্রে পারিবারিক বাস্তবতা ধরা পড়েছে শিবের ঘর-জামাই থাকার কালে। গৌরীকে বিবাহ দিলেও স্বামী সন্তান নিয়ে গৌরী বাপের বাড়িতেই রয়েছেন। গৌরী সংসারের সামান্য খড়-কুটোটুকু নেড়ে খাবেন না। এদিকে জামাইও নিষ্কর্মা। মেনকার এসব বেশিদিন সহ্য হয় না। রামানন্দের তুলনায় মুকুন্দ এই পারিবারিক চিত্রটি অত্যন্ত বাস্তবিকতার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন। দুধ উথলে উঠেছে অথচ তাতে জল না দিয়ে গৌরী পাশা খেলতে মগ্ন। অতএব মেনকার সঙ্গে তনয়ার কলহ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। সামাজিক-পারিবারিক দিক থেকে মেনকা অত্যন্ত বাস্তবিক আচরণ করেছেন—

''হাথে পাটী করি গৌরী ডাকেন দশ দশ
হেন কালে মেনকার বাড়িল বিরস।

তোমায় ঝি হইতে মোর মজিল গার‍্যাল
ঘরে জাওঙাঞি রাখিআ পুষিব কতকাল।
প্রভাতে ভাতের কান্দে কার্তিক গণাই
চারি কড়ার সম্ভাবনা তোমার ঘরে নাঞি।
মিথ্যা কাজে ফিরে পাতি নাঞি চাষবাস
ভাত কাপড় কত না জোগাব বার মাস।
দুগ্ধ উত্তলিআ পড়ে নাঞি দেহ পানি
সখি সঙ্গে খেল পাশা দিবস রজনী।
দরিদ্র তোমার পতি পরে বাঘছাল
সবে ধন বুড়া বৃষ গলে হাড়মাল।
প্রেত ভূত পিশাচ মেলিআ তার সঙ্গ
অনুদিন কত না কিনিঞা দিব ভাঙ্গ।
লোক - লাজে স্বামী মোর কিছু নাঞি কয়
জামাতার পাকে হইল ঘরে সাপের ভয়।
দুই পুত্র তিন দাসী স্বামী শূলপাণি
প্রেত ভূত পিশাচের লেখা নাঞি জানি।
অনুদিন কতেক সহিব উৎপাত
রাঁধিয়া বাড়িয়া মোর কাঁকালে হৈল বাত।''[১০৩]

মেনকার উক্তিতে কন্যার প্রতি কোনরূপ ক্রোধ নয়, আত্মকষ্টের কথা উচ্চারিত হয়েছে। মেনকার বচন কর্কশ হলেও তা একান্ত রূপেই বাস্তবিক। বাঙালির মাতৃহৃদয়ের প্রকাশ ঘটেছে মেনকার চরিত্রে। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে মেনকার ন্যায় জননী রূপে আর দ্বিতীয় কোন চরিত্রের সন্ধান মেলে না।

৩. ইন্দ্রের স্ত্রী / নীলাম্বরের মা : রামানন্দের চণ্ডীমঙ্গলে ইন্দ্রের স্ত্রী তথা নীলাম্বরের মাতার উল্লেখ রয়েছে। পুত্রের দেবতনু ত্যাগ করায় শিবকে ভর্ৎসনা করেছেন মাতা—

''চিরকাল পুত্র যে পূজিলা সেই পায়।

তবে কেন আমাকে হইল হেন দায়।।
শিবের সেবাতে কিবা কৈলা অভিচার।
তথাপি ত আশুতোষ বলে নাম তাঁর।।''[১০৪]

পুত্র ছেড়ে চলে যাওয়ায় দীর্ঘ শোক প্রকাশ করেছেন মাতা এবং মহেশ্বর ও পার্বতীকে প্রবল বাক্য বাণে বিদ্ধ করেছেন। পুত্রের চলে যাওয়ায় মাতার এই শোক প্রকাশ স্বাভাবিক—

''হায় হায় অরে পুত্র কি হৈল আমায়।
হর গৌরী সেবা কর্য়া কারে হেন দায়।।
এত বল্যা জননী কান্দেন উচ্চস্বরে।
বধূ লৈয়া যান মাতা কৈলাসের পরে।।
শিবের আক্ষেপ কর্য়া কন বার বার।
প্রভু হৈয়া কেমনে করিলা অবিচার।।''[১০৫]

মুকুন্দের কাব্যে নীলাম্বরের মায়ের উপস্থিতি নেই।

৪. পদ্মাবতী : মুকুন্দের কাব্যে পদ্মাবতী গৌরীর সহচরী। কাব্যে পদ্মাবতীকে প্রথম পাওয়া যায় 'গৌরীর খেদ' অংশে। গৌরী পিতামাতার ব্যবহার ও হরের আচরণে মর্মাহত হলে পদ্মাবতীর কাছে সব কথা জানিয়ে উপদেশ নেন। পদ্মাবতী তাঁকে পূজা প্রচারের উপদেশ দেন। পদ্মাবতীর উপদেশেই দেবীর 'মঙ্গলচণ্ডিকা' রূপে প্রতিষ্ঠার যাবতীয় সূত্র নির্দেশ করেছেন। মুকুন্দ চক্রবর্তী কাব্যে দেবখণ্ডের সঙ্গে লৌকিক খণ্ডের সম্মেলন ঘটিয়েছেন পদ্মাবতী। গৌরী মঙ্গলচণ্ডিকা রূপে কলিযুগে কলিঙ্গ রাজার দেশে আসবেন। পশুদের পূজা গ্রহণ, নীলাম্বর - ছায়ার মর্তে জন্মগ্রহণ এমন ধনপতি সওদাগরের উপাখ্যানের কথা প্রথম পদ্মাবতীর কাছেই পাওয়া যায়।

কাব্যে গৌরীর সহচরী রূপেই পদ্মাবতীর একমাত্র পরিচয়—

''উচিত বলিতে আমি সভাকার ঐরি
দুঃখ জৌতুক দিআ বাপা বিভা দিল গৌরী।
দোষ ঘাটী কিছুই নাঞি পাপ পরমাদ
কি কারণে পাই পদ্মা এত অপবাদ।।''[১০৬]

পদ্মার সঙ্গে যুক্তি করেই গৌরী নন্দন কাননে মায়াজাল পাতেন—

‘‘পদ্মাবতী সনে যুক্তি করিআ অভয়া
নন্দনকাননে আমি পাতিলেন মায়া।
ফুলহীন কইল চণ্ডী নন্দনকানন
ফলফুলহীন হইল জত উপবন।’’[১০৭]

রামানন্দের কাব্যে সহচরী রূপে পদ্মার উল্লেখ থাকলেও কাব্যমধ্যে তার আর কোনরূপ বিশেষ ভূমিকা নেই—

‘‘জয়া বিজয়া নাম আর পদ্মাবতী।
কন্যা তার তিন সখী দেন শুদ্ধ মত।।’’[১০৮]

মুকুন্দ পদ্মাবতীকে তাঁর কাব্যে যতটা গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন, রামানন্দ ঠিক ততটাই এড়িয়ে গেছেন। তবে ধনপতি উপাখ্যানে পদ্মাবতী চণ্ডীকার সখী রূপে কাব্যমধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। চণ্ডীর পূজা প্রচারে পদ্মাবতী তাঁকে সহায়তা করেছেন।

৫. গঙ্গা : গঙ্গার প্রসঙ্গ মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে মাত্র একবার এসেছে। কালকেতুর গুজরাট নগর নির্মাণের পর প্রজা বসতির জন্য চণ্ডী গঙ্গার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। চণ্ডীর উদ্দেশ্য হল - গঙ্গা কলিঙ্গদেশে গিয়ে সব ডুবিয়ে দেবে এবং বিপদগ্রস্থ প্রজারা কলিঙ্গরাজ্য ছেড়ে গুজরাট নগরে অবস্থান করবে। কিন্তু গঙ্গা একাজ করতে রাজি হননি। বরং চণ্ডীকে পাপী বলে বাক্য বাণে বিদ্ধ করেছেন—

‘‘গঙ্গা সাধিতে আপন কাম আইলাঙ তোমার ধাম
বহিবে আমার কিছু ভার
প্রাণের বহিনি গঙ্গে চল গো আমার সঙ্গে
জাব দেশ কলিঙ্গ রাজার।
দিদি সন্তাপ কর গো মোর দূর
ধরিয়া উন্মত্ত-বেশ হাজাব কলিঙ্গ দেশ
তসে বৈসে গুজরাট-পুর।
হই গো বিষ্ণুর দাসী বিষ্ণুপদ হইতে আসি

সেই প্রভু গতি সভাকার।

হইআ বিষ্ণুর অংশা কার নাহি করি হিংসা

কেন দেশ হাজাব রাজার।

পর-পীড়া দেখি লাগে ডর

পরের দেখিআ দুঃখ হই আমি অশ্রুমুখ

তারে বড় সদয়হৃদয়।

কুম্ভীরমকরগণ জীব হিংসা অনুক্ষন

কিবা গুণে ধর তারে কোলে

মহাপাপ জারে গায় সে জন তোমায়ে নায়

কে তোমারে বৈষ্ণবী বলে।''[১০৯]

(খ) আখেটিক খণ্ড

১. ফুল্লরা : চণ্ডীমঙ্গলের আখেটিক খণ্ডে নায়িকা ফুল্লরা ব্যাধ সঞ্জয়কেতুর কন্যা ও কালকেতুর পত্নী। আসলে নীলাম্বরের স্ত্রী ছায়াই কালকেতুর পত্নী ফুল্লরা রূপে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করে। স্বভাবতই অন্যান্য নারী চরিত্রগুলি অপেক্ষা ফুল্লরা একটু বেশি অংশ জুড়ে রয়েছে আখ্যান ভাগে। প্রকৃতপক্ষে কাব্যে ফুল্লরার দুটি রূপ প্রতিফলিত—

১. ব্যাধনারী ও কালকেতুর পত্নীরূপে

২. রাজা কালকেতুর রাণীরূপে

মুকুন্দের কাব্যে রয়েছে—কালকেতুর বিবাহের উদ্যোগে ঘটক সোমাই ওঝা সঞ্জয়কেতুর কন্যা ফুল্লরার খোঁজ দিয়েছে এবং রাজযোজটক হিসেবে দেখা গেল, কালকেতু-ফুল্লরাকে —'যেন হাঁড়ির মত সরা।' প্রকৃতপক্ষে গৃহস্থালী কর্মে নিপুণা ফুল্লরা তার যোগ্য সহধর্মিণী। শ্বশ্রূমাতা নিদয়ারও অনাবিল সুখ—

''নিদয়ার সুখ বড় গৃহকার্যে বধূ দড়

কুলযশ রক্ষণের হেতু।''[১১০]

ফুল্লরা গৃহকর্মের সঙ্গে বাইরে হাটে হাটে মাংসের পশরা নিয়ে যায়—

''ফুল্লরা আইল ঘরে নিদয়া জিজ্ঞাসা করে

কহে বামা হাটের বিবরণ

আজ্ঞা নিদয়ার ঘরে ফুল্লরা রন্ধন করে

আগে ধর্মকেতুর ভোজন।''[১১১]

রামানন্দ ফুল্লরার সংসারের এই দিকটিকে উল্লেখ করেননি। মুকুন্দ গার্হস্থ্য জীবনের চিত্রপট অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত শিল্পী। শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি পুত্রবধূর অকৃত্রিম ভক্তি শ্রদ্ধার প্রমাণ তাঁদের মুক্তি হেতু বারাণসী প্রস্থানের চিত্রে পরিস্ফুট—

''দম্পত্যে লোটায়্যা কান্দে কেশ পাশ নাহি বান্ধে

মাসে মাসে পাঠান সম্বল।''[১১২]

এরপর স্বামীই তার একমাত্র সংসার। তাকে ঘিরেই চলে ফুল্লরার সবকর্ম ও সবস্বপ্ন। দারিদ্র ক্লিষ্ট সংসারে কল্যাণী বধূর ন্যায় তার আচরণ, দুঃখ-দারিদ্র গোপন করে স্বামীর সন্তুষ্টি বিধানে সদা তৎপর। কালকেতু পশুশিকার করে আর ফুল্লরা তা বাজারে বিক্রি করে—

''ফুল্লরা বেচয়ে খড়্গ দরে এক পণ

ব্রাহ্মণ সজ্জন লয় করিতে তর্পণ।''[১১৩]

স্বামীকে অন্ন পরিবেশনেও তার সেই সদা-সতর্ক কল্যাণময়ী চরিত্রটি দু'একটি ক্ষুদ্র চিত্রেই বিধৃত—

''ঘরে হইতে ফুল্লরা বীরের পাইল সাড়া

সম্ভ্রমে বসিতে দিল হরিণের ছড়া।

মোকা নারিকেলেতে পুরিয়া দিল জল

ঝাট জল দিয়া কৈল ভোজনের স্থল।

পাখালিল মহাবীর পদ পাণি মুখ

ভোজন করিতে বৈসে মনের কৌতুক।

সম্ভ্রমে ফুল্লরা পাতে মাটিআ পাথরা

বেঞ্জনের তরে দিল নৌতুন খাপরা।''[১১৪]

স্বামীর প্রতি এই সম্ভ্রমটুকু তাকে অনন্যা করে তুলেছে। স্বামী প্রেমের অধিকারটুকু ছদ্মবেশিনী চণ্ডীর আবির্ভাবে খোয়ানোর আশঙ্কায় সে আতঙ্কিত। পার্থিব বিত্তে ধনী না হলেও হৃদয়বৃত্তে সে ধনী। তাই রূপসী নারীকে দেখে স্বামীর অংশভাগিনী হওয়ার আশঙ্কায় সে আতঙ্কিত—

''হেন বাক্য হইল যদি অভয়ার তুণ্ডে
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে ফুল্লরার মুণ্ডে।
হৃদে বিষ মুখে মধু জিজ্ঞাসে ফুল্লরা
দূরে গেল খুধা তৃষ্ণা রন্ধনের ত্বরা।''[১১৫]

ফুল্লরার মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যায় রামানন্দ এই অংশে কবিকঙ্কণকেই অনুসরণ করেছেন—

''কুড়্যার দুয়ারে আস্যা দেখেন সুন্দরী।।
ভয়েতে হিংসাতে রামা কাঁপে থর থরা।
দূয়ে গেল ক্ষুধা গেল রঞ্জনের ত্বরা।।
সুন্দরীকে দেখিয়া শুধায় বার বার।
কেনে হেথা আল্যা তুমি কূলবধু কার।।''[১১৬]

এই রূপসী নারীকে বিতাড়নের জন্য তার বারমাসের দুঃখের কাহিনিও বর্ণনা করেছে এবং অভিমানে স্বামীর উদ্দেশ্যে ক্রন্দনরতা ফুল্লরা গোলাহাটে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। ক্রোধে অভিমানে বিপদাপন্ন হয়ে স্বামীর উদ্দেশ্যে বলেছে—

''পিপিড়ায় পাক উঠে মরিবার তরে
কাহার সোলস্যা কন্যা আনিআছ ঘরে।
এতদিনে মহাবীর পাপে গেল মন
আজি হইতে তুমি লঙ্কার রাবণ।''[১১৭]

রামানন্দের কাব্যে ফুল্লরার এই ক্ষোভ অনুপস্থিত। বরং ক্রন্দনরতা ফুল্লরা কালকেতুকে বলেছে—

''কি করিনু দোষ মোরে কেন রোষ
আমি দুখী অভাগিনী।
তুমি কেন মোরে ফেল দুখ ঘোরে
আনিয়া দিলা সতিনী।।
কৈল পাপ আশ হবে সর্বনাশ
তুমি হইলা রাবণ।''[১১৮]

আবার অন্যান্য রমণীর ন্যায় বস্তুনিষ্ঠ ঘরণী বলেই দেবীদত্ত একটি অঙ্গুরীয় গ্রহণে নারাজ—

‘‘ফুল্লরা রমণী দেই জয় জয় ধ্বনি
বীর হস্তে দেন চণ্ডী মানিক অঙ্গুরি
লইতে নিষেধ করে ফুল্লরা সুন্দরী।
একটি অঙ্গুরি হইতে হব কোন কাম
সারিতে নারিবে প্রভু ধনের দুর্নাম।
এই অঙ্গুরির মূল্য সাত কোটি টাকা
ফুল্লরা শুনিঞা মূল্য মুখ কৈল বাঁকা।
ফুল্লরার অভিলাষ বুঝিআ পার্বতী
আর কীছু ধন দিতে দিল অনুমতি।’’[১১৯]

রামানন্দের কাব্যে ফুল্লরার চরিত্রের এই দিকটি অনুপস্থিত। অন্যদিকে মুকুন্দের কাব্যে রাজরাণী হিসেবে ফুল্লরা অনুজ্জ্বল। তার চরিত্রে বন্য গ্রাম্যরূপই প্রতিভাত। তাই দ্বিতীয় রূপে সে নিতান্ত বিবর্ণা। যতক্ষণ ফুল্লরা ব্যাধ রমণী ততক্ষণই সে স্বাভাবিক কিন্তু রাজমহিষী ফুল্লরা কিছুটা আড়ষ্ট, দ্বিধাগ্রস্ত। আসলে মুকুন্দ ছিলেন প্রত্যক্ষ বাস্তবের কবি, পর্যবেক্ষণ শক্তির ওপরেই মূলত তাঁর প্রতিষ্ঠা। তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতায় ব্যাধ রমণী ফুল্লরা জীবন্ত হয়ে উঠলেও রাজমহিষী ফুল্লরার বর্ণনায় তাঁর কলম একেবারেই দ্বিধাগ্রস্ত। কলিঙ্গরাজ গুজরাট নগর আক্রমণ করলে ফুল্লরার ভীরুতা কালকেতুকে দুর্বল করে তুলেছে। তার পরামর্শেই কালকেতু ধান্যঘরে আত্মগোপন করেছে। ফুল্লরার নির্বুদ্ধিতার ফলেই কালকেতু কোটালের হাতে বন্দি হয়েছে। পরে স্বামীকে বাঁচানের জন্য কোটালের কাছে কান্নাকাটি করেছে—

‘‘না মার না মার বীরে নিদআ কোটাল
গলার ছিঁড়িয়া দিমু সতেশ্বরি হার।
চুরি নাহি করি কোটাল ডাকা নাহি দি
ধন দিআ গেলা দুর্গা হেমন্তের ঝি।’’[১২০]

ফুল্লরা পরবর্তীকালে রাজমহিষী হলেও কোন ক্ষত্রিয় নারী নয়। তাই তার এরূপ আচরণ করাই সঙ্গত।

রামানন্দের কাব্যে ফুল্লরা কিছুটা বাস্তব বুদ্ধি সম্পন্ন আচরণ করেছে। গুজরাট নগর নির্মাণের পর কালকেতুর রাজ্যে চণ্ডীর পূজার বর্ণনা রয়েছে। ফুল্লরা নীচ জাতি তাই আগে

ব্রাহ্মণের পূজা করেছে পরে ফুল্লরা পূজা করেছে—

''ফুল্লরা করেন স্তুতি নাহি জানি পুঁথি
আমি মূঢ় অবোধ অবলা।''[১২১]

আবার পুরোহিতরা নৈবেদ্য ও উপহারের অভাবে রুষ্ট হলে ফুল্লরা তাদের রাজমহিষীর মতো উপহারের ভরিয়ে দিয়েছে—

''ফুল্লরা বলেন শুন বক্সী দেওয়ান।
পাট সাড়ী ঠাকুরেরে দেও ষোলখান।।
এইরূপ সকল বুঝিয়া দেও গিয়া।
দ্বিজ বলে উপহাস কর রাজপ্রিয়া।।
রাণী কন হেন আজ্ঞা আমারে না হবে।।
ব্রাহ্মণেরে হাসিলে কি তার সৃষ্টি রবে।।
কখনো না হয় যেন এমন দুর্মতি।।
দ্বিজ হাস্যা বলে জানি তুমি পুণ্যবতী।।
তোমার সমান বা চরিত্র হবে কার।
সতত তোমার চর্চা ঘরেতে আমার।।''[১২২]

রামানন্দ তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' ফুল্লরাকে রাজমহিষীর মতোই অঙ্কন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁর কাব্যে কালু রাজার কাছে বন্দি হয়েছে নিজের বোকামির জন্য, ফুল্লরার সেখানে কোন ভূমিকা নেই। বরং কালকেতু বন্দি হলে ফুল্লরা তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। পরবর্তীকালে চণ্ডীর কৃপায় তারা রাজ্য ফিরে পায় এবং ফুল্লরাকে নিয়ে কালকেতু সুখে সংসার করে। তাদের পুষ্পকেতু নামে এক পুত্র হয়। স্বর্গ থেকে রথ এসে কালকেতু ও ফুল্লরাকে নিয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে উভয় কবির কাব্যেই ফুল্লরা সযত্নে রচিত একটি চরিত্র।

২. মুরারি শীলের স্ত্রী : মুরারি শীল ব্যবসায়ী, মহাজন। মুকুন্দের কাব্যে তার স্ত্রীর কোন নাম নেই। কবি তাকে 'বান্যানী' বলে পরিচিত করেছেন। 'বান্যা' মুরারির স্ত্রী তাই 'বান্যানী'। কাব্যমধ্যে তার বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

কালকেতু দেবী প্রদত্ত অঙ্গুরী ভাঙাতে এসেছিল। মুরারি ভেবেছিল কালকেতু বুঝি

মাংসের দাম নিতে এসেছে, তাই কালকেতুকে এড়িয়ে যেতে মুরারির শেখানো কথা মতো বান্যানী বলে পোতদার বাড়ি নেই। এখানেই শেষ নয়, উপরন্তু কালকেতুকে একভাড় কাঠ এনে দিতে বলে। আবার যখন কালকেতুর আগমনের প্রকৃত কারণ জানতে পেরেছে; তখন তার কর্তৃত্বপূর্ণ ব্যবহারকে শিথিল করেছে। এসব কিছুর মধ্যেই তার বুদ্ধিদীপ্ত চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়—

''বীরের বচন শুনি আসি বলে বান্যানি
ঘরে নাহী সহর-পোতদার
সকালে তোমার খুড়া গেছেন খাতকপাড়া
কালি দিব মাংসের ধার।
আজি কালকেতু জাহ ঘর
কাঠ আনিহ এক ভার হাল বাকি দিব ধার
মিষ্ট কিছু আনিহ উধার।''[১২৩]

রামানন্দের কাব্যে মুরারি নামের কোন উল্লেখ নেই। তবে বাঞ্ছারাম নামের এক পোদ্দারের উল্লেখ রয়েছে। কালকেতু তার কাছে মুদ্রা ভাঙাতে এসেছে। মুরারির স্ত্রীর মতো সেও কালকেতুকে মিথ্যা কথা বলে বিদায় করার চেষ্টা করেছে। কালকেতুকে ছলনায় উভয়েই একই পন্থা অবলম্বন করেছে—

''খুড়া খুড়া বল্যা বীর ডাকে বার বার।
খুড়ি বলে ঘরে নাই খুড়া ত তোমার।।
কালি আস্যো দেয়া যাবে কড়ি ছয় বুড়ি।
কালু বলে টাকা ভাঙ্গাইব আমি খুড়ি।।
খুড়ি বলে থাক তবে দেই দেখি ডাক্যা।
বাহির হইল বান্যা কিছুকাল থাক্যা।।''[১২৪]

কবি উপস্থিত বুদ্ধি সহযোগে চরিত্রটিকে নির্মাণ করেছেন।

৩. নিদয়া ও হীরাবতী : নিদয়া ও হীরাবতী উভয়েই জননী চরিত্র। নিদয়া ধর্মকেতুর স্ত্রী এবং কালকেতুর মাতা অন্যদিকে হীরাবতী সঞ্জয়কেতুর স্ত্রী এবং ফুল্লরার মাতা। উভয়

কবির কাব্যে নিদয়ার সম্পর্কে কিছু কথা থাকলেও হীরাবতী সম্পর্কে কবিরা প্রায় কিছুই বলেননি। সাধভক্ষণ কিংবা কালকেতু বিয়ের প্রসঙ্গে নিদয়ার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি কাব্যে রয়েছে। কালকেতু-ফুল্লরার বিবাহ হলে মুকুন্দের কাব্যে নিদয়া ও ধর্মকেতু বারাণসী চলে যান। রামানন্দের কাব্যে নিদয়া সংসারে থেকেই পরলোকগমন করেন। কবিকঙ্কণ নিদয়াকে একটু বাস্তবসম্মত করে উপস্থাপিত করেছেন—

''সেই দিন ধর্মকেতু রতিরঙ্গ মনে
দৈবযোগে গর্ভ তার রহে সেই দিনে।
প্রথম মাসের গর্ব জানি বা না জানি
দ্বিতীয় মাসের বেলা করে কানাকানি।
তৃতীয় মাসের বেলা করে ভূতলে শয়ন
চারি মাসে করে রামা মৃত্তিকা ভক্ষণ।
পাঁচ মাসে নিদয়ারে না রুচে উদন
ছয় মাসে কাঞ্জী করঞ্জায় জায় মন।
সাত মাসে রসবাস দিল ধর্মকেতু
জ্ঞাতি বন্ধু সভে সাধ দেই শুভ হেতু।''[১২৫]

এভাবে কবি মুকুন্দ নিদয়ার গর্ভে কালকেতুর জন্মের সমস্ত বর্ণনা দিয়েছেন, কিন্তু রামানন্দের কাব্যে এসব বর্ণনা নেই। তাই রামানন্দের কাব্যে নিদয়া অনেকখানি ম্লান চরিত্রে পরিণত হয়েছে।

(গ) বণিক খণ্ড

১. লহনা : বণিক খণ্ডে তথা ধনপতি আখ্যানের অন্যতম নারী চরিত্র লহনা। ধনপতির প্রথম স্ত্রী। সে নব-যৌবনা নয়। পুত্রবতীও নয়। তাই ধনপতি দ্বিতীয় বিবাহের জন্য মত প্রকাশ করে—

''উজানী নগরে ঘর ধনপতি সদাগর
লহনা নামেতে জায়া তার।
সন্তান না হয় তার খেদ করে বার বার

বিবাহ করিতে হৈল আর।।''[১২৬]

মুকুন্দের কাব্যে রয়েছে পায়রা উড়াতে গিয়ে খুল্লনাকে দেখে ধনপতির মনে বিবাহ বাসনার উদয় হয়। কিন্তু খুল্লনার মা রম্ভাবতী এই বিবাহে রাজী নন। কারণ তিনি জানেন লহনা ধনপতির প্রথম স্ত্রী। লহনা তার নিজের ভাসুরের কন্যা। একে সতীন তার ওপর লহনার খল স্বভাব সম্পর্কে তিনি পরিচিত। তাই তিনি স্বামীকে বলেছেন—

''লহনারে নাঞি জান হেন বাক্য মুখে আন
করুণা তোমার নাঞি মনে।
তোমারে বুঝাব কী লহনা ভাইএর ঝি
যদি তুমি দিবে তার সতা...''[১২৭]

রম্ভাবতী কন্যার বিবাহে তীব্র আপত্তি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু লহনাকে আমরা দেখলাম সতীনের আশঙ্কায় কাতরা নারী রূপে। দ্বিতীয় বিবাহের পরে লহনাকে কপট কথায় ভুলিয়েছেন ধনপতি—

''কপট প্রবন্ধে সাধু লহনা বুঝান।
রূপ নাশ কৈলে প্রিয়ে রন্ধনের শালে
চিন্তামণি নঠ কৈলে কাঁচের বদলে।
স্নান করিআ শিরে না দেহ চিরূনি
রৌদ্র নাহি পায় কেশে শিরে বিন্ধে পানি।
- -
মাসি পিসি মাতুলী বহিনী সতিনী
নাহি কেহ রহে ঘরে হইআ রান্ধনি।
যুক্তি যদি লয় মনে কহিবে প্রকাশি
রন্ধনের তরে আমি আন্যা দিব দাসী।
সদাগর বলে জত কপট প্রকাশ
উত্তর না দেই রামা ছাড়এ নিঃশ্বাস।''[১২৮]

নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করে ধনপতি। বড় রাজকীয় সংসারে দায় দায়িত্বের পরিশ্রমে লহনার যৌবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, নববধূ তার দাসীর মতো সেবা করবে। এই কপট কথায়

ভুলবার পাত্রী নন কোন নারী। বরং লহনা অনুভব করে তার যৌবন গত হয়েছে। স্বামী তরুণী নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। এই অপমানে লহনা চরিত্রে হিংসার উদ্রেগ ঘটে। বুদ্ধিমতী লহনা কিছু বাড়তি অলঙ্কার উপহার পেয়ে আপত্তি করল না ঠিকই, কিন্তু মনের মধ্যে লহনার প্রতি সপত্নী সম্পর্কে ঈর্ষা ও ক্রোধ রয়ে গেল।

ধনপতি বাণিজ্য যাত্রায় বেড়িয়ে পড়লে, লহনা সে সুযোগ গ্রহণ করে। কবিকঙ্কণের কাব্যে প্রথমে অবশ্য খুল্লনার প্রতি লহনার স্নেহের প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। পরে দুর্বলা ও লীলাবতীর পরামর্শে খুল্লনার প্রতি অত্যাচার শুরু হয়। এর দ্বারা বোঝা যায় লহনার হৃদয় মমতা শূন্য ছিল না। তরুণী খুল্লনার প্রতি স্নেহের মনোভাব তার হৃদয়ে ছিল। পরে তা সপত্নীত্বের জ্বালায় ঈর্ষায় পরিণত হয়।

প্রথমে লহনা কৌশলে খুল্লনার মর্যাদাহানি করার চেষ্টা করে। মিথ্যা করে জাল চিঠি দেখিয়ে বসন-ভূষণ কেড়ে নেয় এবং ছাগল চড়ানোর কাজে নিযুক্ত করে। লহনার মনোগত বাসনা জাল চিঠিতে প্রকাশ পায়।

খুল্লনা লহনার জালিয়াতি ধরে ফেলে। কিন্তু লহনা গায়ের জোরে খুল্লনাকে ছাগল রাখার কাজে নিযুক্ত করে। এইরূপে খুল্লনার যৌবন সৌন্দর্য যাতে নষ্ট হয়ে যায় সেরূপ প্রচেষ্টা করে। মনস্তত্ত্বিক দিক থেকে তার এরূপ আচরণ সঙ্গত বলেই মনে হয়।

অবশেষে ধনপতি ফিরে আসার সংবাদে সে খুল্লনাকে পীড়ন থেকে মুক্তি দেয়। এসব কর্মের জন্য সদাগর তাকে দোষী সাব্যস্ত করতে চাইলেও লহনা কিন্তু তার রূঢ় দাপট থেকে সরে আসেনি।

ধনপতি ফিরে এলে লহনা অনুভব করে এবারে খুল্লনার সঙ্গে সংসার যুদ্ধে তার হার নিশ্চিত। কারণ সে পুত্রহীনা। লহনা চণ্ডী ভক্ত নয়। তাই গল্পের প্রয়োজনে লহনা খল চরিত্রে পরিণত হয়েছে। কিন্তু কবি মুকুন্দ ও কবি রামানন্দ উভয়েই লহনার মনস্তাত্ত্বিক দিকটিকে উপেক্ষা করতে পারেননি। সেদিক থেকে বিচার করলে লহনা চণ্ডীমঙ্গলের গুরুত্বপূর্ণ নারী চরিত্রে পরিণত হয়েছে।

কাহিনির দ্বিতীয়ার্ধে লহনা গৌণ হয়ে পড়েছে। ধনপতির বাণিজ্য যাত্রাকালে খুল্লনার প্রতি শেষবারের মতো শত্রুতা করতে ছাড়েনি। দেবতার কাছে প্রার্থনা করেছে ধনপতি যাতে বাণিজ্য থেকে ফিরে না আসে। কারণ লহনা স্বামী থাকতেও স্বামীহীনা। খুল্লনার পতি পলে

দুরবস্থা ঘটুক এই তার কামনা। রামানন্দ অবশ্য তাঁর কাব্যে লহনার এরূপ মনোভাবের কোন উল্লেখ করেন নি। কারণ তিনি মনুষ্যের এরূপ ব্যবহার লিখে গ্রাম্যগীত রচনা থেকে বিরত থাকতে চেয়েছেন—

''মনুষ্যের ব্যবহার লিখিলেই পাপভার
গ্রাম্য গীত বল্যা তাকে কয়।
মুনি বাক্য যে যে ঠাঞি তা লিখিলে পাপ নাঞি
গ্রাম্য গীত শুন্যা পাপ হয়।।''[১২৯]

রামানন্দের কাব্যে লহনার মাতৃরূপের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। একদিন শ্রীপতিকে না পেয়ে খুল্লনার মত লহনাও ব্যাকুল হয়ে উঠেছে—

''কান্দিয়া আল্যেন ঘরে লহনার পার পরে
পড়্যা কন কি হবে উপায়।
লহনা কাঁদিয়া কন কোথা রৈল প্রাণধন
খুলনা করেন হায় হয়।''[১৩০]

মুকুন্দের কাব্যে লহনার পুত্র বাৎসল্যের এই দিকটি কবি প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করেননি।

২. খুল্লনা : বণিক খণ্ডে প্রধান নারী চরিত্র খুল্লনা। মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতি উভয়েই এই চরিত্রটিকে সযত্নে এঁকেছেন। চরিত্রটি গার্হস্থ্যপ্রেম, স্নেহ, বাৎসল্য, দুঃখভোগ প্রভৃতি সমগ্র দিক প্রকাশে উজ্জ্বল।

ধনপতি সদাগরের সঙ্গে পায়রা ওড়াতে গিয়ে তাদের প্রথম সাক্ষাৎ। ধনপতির উড়ন্ত পায়রা খুল্লনার আঁচলে গিয়ে পড়ে। এরপর তাদের আলাপে কিঞ্চিৎ রোমান্টিক হৃদয় আবেদন প্রকাশ পেয়েছে। ধনপতি প্রস্তাব পাঠায়। কিন্তু এ বিবাহে মাতার প্রবল আপত্তি, কারণ ধনপতি পূর্ব বিবাহিত। তার প্রথমা স্ত্রীর নাম লহনা। খুল্লনার জেঠতুত বোন লহনা। প্রথমা পত্নীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও খুল্লনার সঙ্গে বণিকের বিবাহ সম্পন্ন হয়। খুল্লনার চরিত্রে প্রণয়- রোমান্টিকতার প্রকাশ ঘটেছে। ছাগল চড়াতে গিয়ে খুল্লনার মুখে প্রণয়-বিরহমূলক সঙ্গীতধর্মী পদগুলি তারই প্রমান।

মুকুন্দ এবং রামানন্দ অত্যন্ত বাস্তব সচেতন দৃষ্টি নিয়ে খুল্লনা চরিত্রটি নির্মাণ করেছেন।

ভাগনির স্বামী হরণে তার মনে কোন অপরাধ বোধ ছিল না। নিজের রূপের প্রতি অহঙ্কার ছিল। খুল্লনা শুধু রোমান্টিক নয়, চতুরাও। ধনপতির চিঠি যে লহনা জাল করেছে তা খুল্লনা আগেই বুঝতে পেরেছে—

''লহনার বোলেতে খুল্লনা পড়ে পাতি
হাসেন খুল্লনা ছন্দ দেখি ভিন্ন-ভাঁতি।
বলে দিদি ইথে আমি না করি তরাস
কে লিখিয়াছে পত্র করি উপহাস।''[১৩১]

কিন্তু লহনা জোড় করে তাকে ছাগল চড়াতে বাধ্য করে। কবি মুকুন্দ খুল্লনার জীবনের কষ্টের কথা বিবৃত করেছেন বারো-মাসের দুঃখ বর্ণনার মধ্যদিয়ে।

স্বামী ফিরে এলে খুল্লনা আবার নিজের মর্যাদা ফিরে পেয়েছে। তার ছাগল চড়াবার দুঃখ কষ্টের কথা বণিককে বলতে ভোলেনি। বিগত যৌবনা লহনাকে বন্ধ্যাত্বের খোঁচা দিয়ে গালাগাল করেছে। খুল্লনার একাকিনী মাঠে বনে ঘুরে ছাগল চড়ানোর বিষয়ে সমাজে কথা উঠেছে। কিন্তু খুল্লনা সতীত্বের পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত। এই বিষয়টিকে কবিরা সীতার অগ্নি পরীক্ষার সঙ্গে তুলনা করেছেন—

''খুলনা বলেন প্রভু না কর্য্যো বিচার।।
আজ্ঞা হয় সে পরীক্ষা করি আর বার।
বহ্নি রূপী কৃষ্ণ মোরে করিবেন পার।।''[১৩২]

খুল্লনা চরিত্রের আর একটি পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে পুত্র শ্রীপতির মাতা হিসেবে। মাতৃত্বের জন্য সে সবকিছু আত্মসমর্পণ করেছে। সে মাতৃত্বের মধ্যেই আত্মমগ্ন। তাই প্রবাসী স্বামীর প্রতি সে উদাসীন। পিতার সন্ধানের উদ্দেশ্যে শ্রীমন্ত সমুদ্রে পাড়ি দিতে চাইলে খুল্লনা আপত্তি করেছে—

১. ''মায় কন কি করিব কোথা তোমা পাঠাইব
সিংহল যে সাগরের পার।''[১৩৩]

২. ''মায়ের ক্রন্দন ছিরু কপাট খুলিল।
ব্যাকুল হইয়া মায় কোলে তুল্যা নিল।।''[১৩৪]

সন্তানের জন্য জননীর উদ্‌বিগ্নতা মাতৃত্বের চিরকালীন এক স্বভাব।

খুল্লনার চরিত্রের ভক্তি পরায়ণতার প্রসঙ্গে দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। মঙ্গলকাব্যের মূল উদ্দেশ্য লোকসমাজে দেব-দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করা। এ উপাখ্যানে দেবনর্তকী রত্নমালা খুল্লনা রূপে মর্তে সে গুরু দায়িত্ব পালন করেছে। খুল্লনার ভক্তিপরায়ণতা বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের দাবি রাখে। কেবল স্বামীর মঙ্গল কামনাই নয়, পরবর্তীকালে সন্তান প্রসবের পর পুত্র শ্রীমন্তের জন্যে খুল্লনা দেবীর শরণ নিয়েছেন। তবে রামানন্দের কাব্যে খুল্লনা শুধুমাত্র চণ্ডী নন, বহ্নি রূপী কৃষ্ণকেও স্মরণ করেছেন।

৩. দুর্বলা : বণিক খণ্ডে ধনপতির গার্হস্থ্য জীবনের সঙ্গে দুর্বলা দাসী ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দুর্বলা ধনপতির পরিবারের দাসী। এ প্রসঙ্গে ক্ষেত্রগুপ্ত বলেছেন—''দুর্বলা দাসীর চরিত্রটি একান্ত প্রাসঙ্গিক। কিন্তু এই টাইপ চরিত্রটিকে কবি প্রাণদান করেছেন। শুধু প্রাণদানই নয়, তার একরঙা চরিত্রে ক্ষণিকের জন্য বর্ণ-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছেন।''[১৩৫]

দুর্বলা একজন স্বার্থ সচেতন নারী। ঘরে-বাইরে তার অবাধ অবস্থান। দুর্বলাকে মাঝে মাঝে বাজার করতে হাটে যেতে হয়। কিন্তু সেখান থেকে হিসেবের ঠকামিতে কিছু লাভের কড়ি পায়। দুর্বলা কাজে ফাঁকিবাজ ও কামচোর এবং অভিনয় -পটুও বটে। সাংসারিক কোন্দল সৃষ্টিতে সে ওস্তাদ। লহনা তাকে মনের কথা জানায়। ধনপতি দ্বিতীয় বিবাহ করলে কাজ থেকে পরিত্রাণের হেতু লহনার মনে খুল্লনার প্রতি কুকথা বলতে থাকে। আবার কখনো দুঃখ থেকে পরিত্রাণের জন্য লহনাকে রান্না ঘরে যেতে পরামর্শ দেয়।

লহনা একপ্রকার মেনেই নিয়েছিল খুল্লনাকে। রাজা বিক্রমকেশরীর নির্দেশে ধনপতি গৌড়ে যাওয়ার আগে খুল্লনাকে রেখে গেলেন লহনার কাছে। লহনার খুল্লনার প্রতি ভালোবাসা দুর্বলার ভালো লাগেনি। তাই—

১. ''প্রেমবন্ধ দু-সতিনে দুবলা দেখিআ মনে
সাত পাঁচ ভাবে দুঃখমতি।''[১৩৬]

২. ''প্রেমবন্ধ দু-সতিনে দেখিআ দুবলা
হৃদে কালকূট বিষ মুখে জেন তুলা।
লহনা খুল্লনা জদি থাকে এক মেলি
পাটী করি মরিব দুজনে দিব গালি।''[১৩৭]

দুর্বলা নিজেকে কর্মমুক্ত রাখতে দুই সতীনের সুসম্পর্ক নষ্ট করেছিল। নবযৌবনা খুল্লনার সঙ্গে বর্ষীয়সী লহনার পার্থক্য বুঝিয়ে দিল। বণিকের খুল্লনার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ লহনাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। শুরু হল দুই সতীনে বিবাদ।

দুর্বলার পরামর্শে লীলাবতী ব্রাহ্মণীর বাড়িতে গমন করল লহনা এবং স্বামী বশের ঔষধের ব্যবস্থা করল। খুল্লনাকে দুর্বলা এতটাই প্রভাবিত করেছে যে তাকে সখী বলেও সম্বোধন করেছে। লীলাবতী বশীকরণের যে ব্যবস্থা করেছিল তার যাবতীয় উপকরণ লহনাকে গোপনে সংগ্রহ করে দিয়েছিল দুর্বলাই। দুর্বলার পরামর্শেই নকল চিঠি দেখিয়ে খুল্লনা লহনাকে অত্যাচার করে ও বনে ছাগল চড়াতে যেতে বাধ্য করে। অন্যদিকে ইছানিতে গিয়ে দুর্বলা দেখা করে খুল্লনার জননী রম্ভাবতীর সঙ্গে এবং সেখানে জানায় বণিকের সংসারের অমঙ্গলের ছায়ার কথা। খুল্লনার ছাগল জড়ানোর দুর্গতির কথা। তিনি দুর্বলাকে কন্যার শুভাকাঙক্ষী ভেবে খুল্লনার অভিভাবিকা নির্বাচন করেন। ধনপতি গৌড় ফিরলে নিজের রূপ পরিবর্তন করে খুল্লনার কাছে প্রিয় হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। এমনকি খুল্লনাকে 'ছোটমা' বলেও সম্বোধন করে। পুরো বিষয়টি বেশ হাস্যকর। স্বামীর সঙ্গে খুল্লনার কথোপকথন দুর্বলা কপাটের আড়াল থেকে শুনেছে। সমস্ত ঘটনা আবার লহনার কাছে এসে বলেছে।

দুর্বলার এই দ্বিচারিতা তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই ঠক প্রবৃত্তি দিয়ে সে ধনপতিকেও ঠকায়। পঞ্চাশ কাহন কড়ি দিয়ে ধনপতি তাকে হাটে পাঠালে সেখানকার দৃশ্য বেশ হাস্যকর—

''চতুর সাধুর দাসী আট কাহনে কিনে খাসী
তৈল সের দরে দেড় বুড়ি
তোলা মূলে তেজপাত খির নিল বিশা সাত
আদা বিশা দরে দেড় বুড়ি।''[১৩৮]

বাজার করার পরিশ্রম বাবদ সে পয়সা কেটে নেয়—

''সঙ্গে ভারি দশ জন তারে দিল দশ পন
আমি খাইনু চারি পণ কড়ি।''[১৩৯]

আবার খুল্লনা সন্তানবতী হলে দুর্বলা আনন্দে মেতে ওঠে। করতালি সহযোগে কৃষ্ণগান শুনিয়ে শ্রীমন্তকে ভুলিয়ে রাখে। দুর্বলা কবিকঙ্কণের সামাজিক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ একটি

চরিত্র হয়ে উঠেছে। রামানন্দ যতি দুর্বলা চরিত্রটিকে এত বিস্তারিতভাবে নির্মাণ করেননি। বাণিজ্য থেকে ধনপতি ফিরে এলে লহনার কুকর্মের জন্য তাকে ত্যাগ করতে চায় কিন্তু লহনা জানায় এসবের জন্য দুর্বলাই দায়ী। দুর্বলাকে বাড়ি থেকে বের করে দেন ধনপতি—

''শুন্যা সাধু লহনাকে ত্যজিবার চায়।
তখন আইল পথে না দেখ্যা উপায়।।
দুষ্টা বলে লওয়াইল দুবলা কুমতি।
শুন্যা দুবলাকে দূর করে ধনপতি।।''[১৪০]

দুর্বলা চরিত্র সৃষ্টিতে মুকুন্দই শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার।

৪. লীলাবতী : লহনার প্রতিবেশিনী লীলাবতী। ধনপতি প্রবাসে গেলে খুল্লনা লহনার বিবাদ শুরু হয়। দুর্বলা লহনাকে গুপ্ত বুদ্ধি দেবার জন্য লীলাবতীকে ডেকে নিয়ে আসে—

''আছত্র আমার সই ব্রাহ্মণী লীলাবতী
তার ঠাঞি দুয়া তুমি যাহ শীঘ্রগতি।
লহনার বাক্যে চলে চেড়ি দুবলা
ভেট নিল কান্দি দুই চিনি চাঁপা কলা।
দুই ভার ডালি নিল দুই ভার বড়ি
সাত কাহন নিল বাছ্যা ঘিয়া ঘোঁটি কড়ি।''[১৪১]

লহনার আহ্বানে লীলাবতী তার বাড়ি এসেছে—

''দুবলার বাক্যে লীলা করিল গমন
লহনা আমিআ কৈল চরণবন্দন।।
পাদ্য অর্ঘ্য দিআ দিল বসিতে আসন
কপুর তাম্বুল দিল নানা আয়োজন।
লীলাবতী তাহার কুশল জিজ্ঞাসন।।''[১৪২]

লহনা স্বামীকে বশ করার জন্য লীলাবতীর জাড়িবুটি ওষুধ -এর সাহায্য নিয়েছে। লীলাবতী তাকে আশ্বাস দেয়—

''কৃপা কর ঠাকুরাণী করিআ ঔষধ পানি

চরণকমলে দেহ স্থান।

ডাকিআ লহনা কান্দে কেশপাশ নাঞি বান্ধে

আশ্বাস করেন লীলাবতী।''[১৪৩]

এমনকি লীলাবতী জাল চিঠিও লিখে দিয়েছে—

''দুই জনে একত্রে বস্যা করেন জুগতি

কপট প্রবন্ধে পত্র লিখে লীলাবতী।

স্বস্তি আগে লিখিআ লিখিল ধনপতি

অশেষ গুণের ধাম লহনা যুবতী।''[১৪৪]

কাহিনির প্রয়োজনে চরিত্রটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। তবে কবিকঙ্কণের কাব্যে এই চরিত্রটি যতটা প্রাণবন্ত, রামানন্দের কাব্যে লীলাবতীর উপস্থিতি ম্লান, কিংবা নেই বললেই চলে। রামানন্দের কাব্যে রয়েছে—

''গ্রামেতে আছিল এক ব্রাহ্মণের নারী।

ছেদভেদ অনেক জানয়ে জাদুগারী।।''[১৪৫]

তথ্যসূত্র :

১. সেন, দীনেশচন্দ্র : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯১, পৃ. ৪৩৫-৩৬।

২. গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ (সম্পাদিত) : রামানন্দ যতি বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ১১৩।

৩. তদেব, : পৃ. ১২২।

৪. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি - ১১০০০১, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ৭।

৫. তদেব, : পৃ. ১১।

৬. তদেব, : পৃ. ১৩।

৭. তদেব, : পৃ. ১৪।

৮. গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ (সম্পাদিত) : রামানন্দ যতি বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ১০৯।

৯. তদেব, : পৃ. ১১৩।

১০. তদেব, : পৃ. ১১৯।

১১. তদেব : পৃ. ১৩৪।

১২. তদেব : পৃ. ১৩৭।

১৩. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি - ১১০০০১, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ২১।

১৪. তদেব, : পৃ. ১৩৬।

১৫. গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ (সম্পাদিত) : রামানন্দ যতি বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ১৩৬।

১৬. তদেব, : পৃ. ২৬।

১৭. তদেব, : পৃ. ১৪৯।

১৮. ভট্টাচার্য, আশুতোষ : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা: লি:, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ১৪২।

১৯. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি - ১১০০০১, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ৯।

২০. তদেব, : পৃ. ৯।

২১. তদেব, : পৃ. ১০।

২২. গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ (সম্পাদিত) : রামানন্দ যতি বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ১০৯।

২৩. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি - ১১০০০১, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ১০।

২৪. তদেব, : পৃ. ১২।

২৫. গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ (সম্পাদিত) : রামানন্দ যতি বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ১১৫।

২৬. তদেব, : পৃ. ১১৭।

২৭. তদেব, : পৃ. ১২১।

২৮. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি - ১১০০০১, পৃ. ৩৪।

২৯. তদেব, : পৃ. ৩৫।

৩০. তদেব, : পৃ. ৩৬-৩৭।

৩১. তদেব, : পৃ. ৩৭।

৩২. গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ (সম্পাদিত) : রামানন্দ যতি বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ১৫১।

৩৩. তদেব, : পৃ. ১৫১।

৩৪. তদেব, : পৃ. ১৫১-৫২।

৩৫. তদেব, : পৃ. ১৫৩।

৩৬. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি - ১১০০০১, ষষ্ঠ মুদ্রণ,

২০১৩, পৃ. ৪২।

৩৭. তদেব, : পৃ. ৪৪।

৩৮. গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ (সম্পাদিত) : রামানন্দ যতি বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ১৫৪।

৩৯. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি - ১১০০০১, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ৬২।

৪০. গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ (সম্পাদিত) : রামানন্দ যতি বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ১৬৭।

৪১. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি - ১১০০০১, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ৬৮।

৪২. তদেব, : পৃ. ৫১।

৪৩. তদেব, : পৃ. ৬৫।

৪৪. গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ (সম্পাদিত) : রামানন্দ যতি বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ১৭১।

৪৫. তদেব, : পৃ. ১৯২।

৪৬. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি - ১১০০০১, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ৪০।

৪৭. তদেব, : পৃ. ৪৩।

৪৮. গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ (সম্পাদিত) : রামানন্দ যতি বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ১৫৫।

৪৯. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি - ১১০০০১, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ৮৫।

৫০. তদেব, : পৃ. ৭৭।

৫১. তদেব, : পৃ. ৭৭।

৫২. তদেব, : পৃ. ৭৮।

৫৩. গুপ্ত, ক্ষেত্র : কবি মুকুন্দরাম, গ্রন্থনিলয় ৫৯/১ বি, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯, পৃ. ৮৪।

৫৪. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি - ১১০০০১, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ৮৪।

৫৫. তদেব, : পৃ. ৮৫।

৫৬. তদেব, : পৃ. ১০৫।

৫৭. তদেব, : পৃ. ১০৬।

৫৮. গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ (সম্পাদিত) : রামানন্দ যতি বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ১৯৩।

৫৯. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি - ১১০০০১, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ৬৫।

৬০. তদেব, : পৃ. ৬৬।

৬১. তদেব, : পৃ. ৬৭।

৬২. তদেব, : পৃ. ৬৭।

৬৩. গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ (সম্পাদিত) : রামানন্দ যতি বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ১৭৬।

৬৪. তদেব, : পৃ. ১৭৭।

৬৫. তদেব, : পৃ. ১৭৭।

৬৬. তদেব, : পৃ. ১৭৭।

৬৭. তদেব, : পৃ. ১৭৯।

৬৮. তদেব, : পৃ. ১৮৭।

৬৯. গঙ্গোপাধ্যায়, ড.শম্ভুনাথ : মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নারী ও পুরুষ চরিত্র, প্রজ্ঞা বিকাশ, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৯, পৃ. ১৬৭।

৭০. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি - ১১০০০১, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ৪৯।

৭১. গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ (সম্পাদিত) : রামানন্দ যতি বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ১৫৫।

৭২. তদেব, : পৃ. ২১৩।

৭৩. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি - ১১০০০১, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ১৫২।

৭৪. গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ (সম্পাদিত) : রামানন্দ যতি বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ২৩৭।

৭৫. তদেব, : পৃ. ২৩৭।

৭৬. তদেব, : পৃ. ২৪৯।

৭৭. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি - ১১০০০১, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ১২৪।

৭৮. তদেব, : পৃ. ২২৪।

৭৯. গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ (সম্পাদিত) : রামানন্দ যতি বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ২৭৮।

৮০. তদেব, : পৃ. ২৭৮।

৮১. তদেব, : পৃ. ২৮৫।

৮২. তদেব, : পৃ. ২৯৬।

৮৩. তদেব, : পৃ. ৩১৩।

৮৪. তদেব, : পৃ. ৩২১।

৮৫. তদেব, : পৃ. ৩২৫।

৮৬. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি - ১১০০০১, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ১৮১।

৮৭. গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ (সম্পাদিত) : রামানন্দ যতি বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ২৩৮।

৮৮. তদেব, : পৃ. ২৪১।

৮৯. তদেব, : পৃ. ১০১।

৯০. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি - ১১০০০১, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ৯।

৯১. তদেব, : পৃ. ১১।

৯২. গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ (সম্পাদিত) : রামানন্দ যতি বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ১১২।

৯৩. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি - ১১০০০১, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ২৫।

৯৪. গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ (সম্পাদিত) : রামানন্দ যতি বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ১৪৪।

৯৫. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি - ১১০০০১, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ২৭।

৯৬. গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ (সম্পাদিত) : রামানন্দ যতি বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ১৪৯।

৯৭. তদেব, : পৃ. ১৫০-১৫১।

৯৮. তদেব, : পৃ. ১৭৬।

৯৯. দাশগুপ্ত, শশিভূষণ : ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, সাহিত্য সংসদ-৩২ এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯, পৃ. ১৯০।

১০০. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি - ১১০০০১, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ৩০৪।

১০১. গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ (সম্পাদিত) : রামানন্দ যতি বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ১২৫।

১০২. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি - ১১০০০১, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ২১।

১০৩. তদেব, : পৃ. ২৫।

১০৪. গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ (সম্পাদিত) : রামানন্দ যতি বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ১৫২।

১০৫. তদেব, : পৃ. ১৫২-১৫৩।

১০৬. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি - ১১০০০১, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ২৭।

১০৭. তদেব, : পৃ. ৩৬।

১০৮. গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ (সম্পাদিত) : রামানন্দ যতি বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ১৪১।

১০৯. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি - ১১০০০১, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ৭৩।

১১০. তদেব, : পৃ. ৪৪।

১১১. তদেব, : পৃ. ৪৪।

১১২. তদেব, : পৃ. ৪৪।

১১৩. তদেব, : পৃ. ৪৫।

১১৪. তদেব, : পৃ. ৪৫।

১১৫. তদেব, : পৃ. ৫৮।

১১৬. গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ (সম্পাদিত) : রামানন্দ যতি বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ১৫৮।

১১৭. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি - ১১০০০১, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ৬২।

১১৮. গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ (সম্পাদিত) : রামানন্দ যতি বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ১৬৬।

১১৯. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি - ১১০০০১, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ৬৪।

১২০. তদেব, : পৃ. ৯৬।

১২১. গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ (সম্পাদিত) : রামানন্দ যতি বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ১৮৪।

১২২. তদেব, : পৃ. ১৮৫।

১২৩. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি - ১১০০০১, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ৬৬।

১২৪. গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ (সম্পাদিত) : রামানন্দ যতি বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ১৭৬।

১২৫. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি - ১১০০০১, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ৩৯।

১২৬. গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ (সম্পাদিত) : রামানন্দ যতি বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ২১৩।

১২৭. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি - ১১০০০১, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ১১৭।

১২৮. তদেব, : পৃ. ১১৯।

১২৯. গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ (সম্পাদিত) : রামানন্দ যতি বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ২৩৭।

১৩০. তদেব, : পৃ. ২৮০।

১৩১. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি - ১১০০০১, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ১৩৭।

১৩২. গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ (সম্পাদিত) : রামানন্দ যতি বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ২৪৬।

১৩৩. তদেব, : পৃ. ২৮১।

১৩৪. তদেব, : পৃ. ২৮১।

১৩৫. গুপ্ত, ক্ষেত্র : কবি মুকুন্দরাম, গ্রন্থনিলয়, ৫৯/১ বি, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯, পৃ. ৯১।

১৩৬. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি - ১১০০০১, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ১৩১।

১৩৭. তদেব, : পৃ. ১৩১।

১৩৮. তদেব, : পৃ. ১৫৮।

১৩৯. তদেব, : পৃ. ১৫৯।

১৪০. গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ (সম্পাদিত) : রামানন্দ যতি বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ২৩৭।

১৪১. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি - ১১০০০১, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ১৩২।

১৪২. তদেব, : পৃ. ১৩৩।

১৪৩. তদেব, : পৃ. ১৩৩।

১৪৪. তদেব, : পৃ. ১৩৬।

১৪৫. গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ (সম্পাদিত) : রামানন্দ যতি বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ২১৯।